ফিকহ, যুক্তি ও সমকালীন আইনশাস্ত্রের আলোকে

পিডিএফ ও কপিরাইট

সংকলন

আবদুল্লাহ শহীদ আল-ওয়াজিদী



ফিকহ যুক্তি ও সমকালীন আইনশাস্ত্রের আলোকে

পিডিএফ ও কপিরাইট

সংকলন

আবদুল্লাহ শহীদ আল-ওয়াজিদী

ফিকহ, যুক্তি ও সমকালীন আইনশাস্ত্রের আলোকে পিডিএফ ও কপিরাইট

প্রকাশকাল: রজব ১৪৪৭

জানুয়ারি ২০২৬

সংকলন: আবদুল্লাহ শহীদ আল-ওয়াজিদী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾

[المائدة :67]

“হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার করুন; আপনি যদি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলেন না।”

অর্পণ

সেই সকল আলিম ও দীনের দাঈদের প্রতি...

যাঁরা নিজেদের জ্ঞানচর্চামূলক, গবেষণামূলক, চিন্তামূলক, দাওয়াতি ও সংস্কারধর্মী গ্রন্থসমূহের পিডিএফ সামাজিক মাধ্যমে বিনামূল্যে ছড়িয়ে দেন—যাতে এসব কাজ তাঁদের এবং তাঁদের পিতা-মাতার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হয়ে যায়, হাজারো নয় বরং লাখো মানুষের হিদায়াতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এবং আল্লাহর দীন আরও ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও বিজয়ী হয়।

সূচীপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার। অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবাগণের প্রতি, এবং তাঁর সেই সব উত্তরসূরীদের প্রতি—যারা তাঁর আনীত দীন উম্মাতে মুসলিমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন নিঃস্বার্থ-নিবিষ্টভাবে।

এ পুস্তিকাটির প্রেক্ষাপট বোঝাতে গেলে বলতে হয়—বর্তমানে বাংলা ভাষায় লিখিত ধর্মীয় বই-পুস্তক ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ ও বিতরণের লক্ষ্যে কিছু ভাই টেলিগ্রাম চ্যানেল, ইন্টারনেট আর্কাইভ, গুগল ড্রাইভ, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য অনলাইন প্লাটফর্মে স্ক্যানকৃত বইগুলো পিডিএফ আকারে আপলোড করে যাচ্ছেন। যদিও বহির্বিশ্বের ওয়েবসাইটগুলোর মতো কোনো সুসংগঠিত প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি এখনো, তথাপি কিছু একনিষ্ঠ ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে বইপত্র স্ক্যান করে দাওয়াহর স্বার্থে উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। বইপত্র ক্রয়, স্ক্যান করার জন্য প্রয়োজনীয় দামী যন্ত্রপাতি, যেমন স্ক্যানার ও কম্পিউটার ইত্যাদি ক্রয়, উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগের মাসিক বিল, এবং বই স্ক্যান করে অনলাইনে আপলোড করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ টিমের সম্মানী প্রদান; অতএব, আমরা যে পিডিএফটি বিনামূল্যে পাচ্ছি, সেটার পেছনে তাদের অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় জড়িত থাকে।

এই পিডিএফ বইগুলো ওয়েবসাইট ও টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলোতে আপলোড করার কারণে বহুদিন ধরে কিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অসন্তুষ্ট এবং কেউ কেউ তো এটিকে কপিরাইট লঙ্ঘনের পাশাপাশি ইসলামি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকেও দণ্ডনীয় বলে আখ্যায়িত করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে এক অনুবাদক এই বিষয়ে নির্দিষ্ট একটি আলিমগোষ্ঠীর মতামতের সারাংশ নিজের ফেসবুক ওয়ালে

শেয়ার করেছেন, যেখানে প্রকাশকদের অবস্থানও সরাসরি সামনে এসেছে। এই পুস্তিকাটি সেই অবস্থানের ওপর একটি বিশদ ও গবেষণাধর্মী পর্যালোচনা।

আধুনিক কালের কপিরাইট আইনসমূহ মূলত একটি নতুন উদ্ভাবন, যা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসলামি অঙ্গনেও প্রচলিত হয়ে পড়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমরা এমন লেখকদেরও জানি যাদের শতশত গবেষণাধর্মী বই এবং প্রবন্ধ অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। যেকোনো বইয়ের হার্ডকপি প্রকাশিত হওয়ার আগেই সেটির পিডিএফ ইন্টারনেটে প্রকাশ করে দেয়াই তাদের নীতি। তবে, বাংলাদেশের লেখকরাও যেন অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেন—আমাদের এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য এমনটা নয়। মূল লক্ষ্য হলো শরীয়তবিরোধী শোষণনির্ভর কপিরাইট আইন সম্পর্কে সকলকে, বিশেষত ইসলামি প্রকাশনা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা, এবং তাদের বিবেক ও চিন্তার দুয়ারে কড়া নাড়া; যেন তারা কেবল ব্যবসায়িক মুনাফার প্রতি আত্মহীন না হয়ে গিয়ে দীন ও উম্মাহর খেদমতের দায়বদ্ধতাকেও সমানভাবে বিবেচনায় আনেন।

আবদুল্লাহ শহীদ আল ওয়াজিদী
১৯ যিলক্বদ ১৪৪৪ হি.
abdullahshahidalwajidi@gmail.com

প্রাককথা

আমাদের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য হলো **“কোনো বইয়ের পিডিএফ শেয়ার করা নিষিদ্ধ বা নাজায়েয”**—এই কথার শরঈ ভিত্তি কী? উদাহরণস্বরূপ, একজন পাঠক একটি বই কিনলেন; এর মানে বইটির হার্ডকপি এখন তার হাতে রয়েছে। এই হার্ডকপি তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই মালিকানার ব্যবহারিক অধিকার (right to usability) কিংবা ব্যবহারিক প্রয়োগ (right to ownership) এমনভাবে খণ্ডন করা যায় না, যা এর মৌলিক মালিকানাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। অর্থাৎ, এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না যা এই সন্দেহ সৃষ্টি করে—মালিক তো বটে কিন্তু এটি ব্যবহার করার অধিকার তার নেই। তিনি চাইলে তার বইটি কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে রেখে দিতে পারেন, যেখান থেকে হাজারো পাঠক সেই বই থেকে উপকৃত হবেন। কিংবা চাইলে বইটি কোনো আলিমকে হাদিয়া দিতে পারেন, যিনি সেই বই অবলম্বনে জুমুয়ার খুতবা বা মাসআলা-মাসায়েলের দারস রেকর্ড করিয়ে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে দেবেন। এমনকি চাইলে তিনি সেই বইয়ের পঞ্চাশটি ফটোকপি বিনামূল্যে লোকজনের মাঝে বিতরণও করতে পারেন। অথবা তিনি সেই বইটি স্ক্যান করে ই-বুক বানিয়ে কারো সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন।

হ্যাঁ, একমাত্র সীমাবদ্ধতা যেটা আরোপযোগ্য হতে পারে, তা হলো—সেই বইয়ের মূল লেখক ও গবেষকের স্বত্ব ও কৃতিত্ব তার প্রতিই সংযুক্ত থাকবে; অর্থাৎ “এটি আমার রচনা” বলা যাবে না, বরং স্বীকার করতে হবে এটি মূলত অমুক লেখকের পরিশ্রমের ফসল। আমাদের বোধগম্যতা অনুযায়ী শরঈ দিক থেকে বিষয়টি এতটুকু স্পষ্ট। আল্লাহই ভালো জানেন।

ফিকহ যেভাবে কপিরাইটকে দেখে

প্রাচীন ফুকাহায়ে কেরামের যুগে কপিরাইটের কোনো আইন না থাকায় এই বিষয়ে তাঁদের কোনো বক্তব্য আমাদের হাতে নেই। আমাদের দৃষ্টিতে এটা একদমই যথার্থ যে—কপিরাইট ইস্যুটি আধুনিক যুগের নতুন উদ্ভাবনগুলোর (بدعات) একটি। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বেও পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে কপিরাইট সংক্রান্ত কোনো আইন বা ধারণার অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপে সর্বপ্রথম কপিরাইট সংরক্ষণের ধারণা গড়ে ওঠে। প্রকাশক ও মুদ্রণ-সংক্রান্ত ব্যবসায়ীরা এই ধারণা সামনে আনেন। তারই সুবাদে ইতালিতে প্রথম কপিরাইট আইন প্রণয়ন হয় ১৪৮২ সালে, ইংল্যান্ডে ১৬২৩ সালে, ফ্রান্সে ১৭৯১ সালে, আমেরিকায় ১৭৮৭ সালে, জার্মানিতে ১৮১৫ সালে এবং উসমানী খিলাফতে ১৮৭৯ সালে।[১] অথচ, পৃথিবীব্যাপী লেখালেখির ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো। সমসাময়িক ফকীহ ও আলিমগণের কপিরাইট সংক্রান্ত তিনটি অবস্থান রয়েছে; একদল আলিম কপিরাইটকে বৈধ বলেছেন, দ্বিতীয় দল এটিকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন এবং তৃতীয় দল বলেছেন লেখকের জন্য কপিরাইট রাখা জায়েয, তবে প্রকাশকের হাতে হস্তান্তর করা জায়েয নয়।[২]

ফকীহগণের মধ্যে আসল মতানৈক্য হলো সম্পদের সংজ্ঞায়। মাল (সম্পদ) কাকে বলে এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টাকে সম্পদ বলা যায় কি না? শাস্ত্রীয় ও প্রযুক্তিগত সংজ্ঞা পরিহার করে যদি সহজ কথায় বলি, ফিকহে হানাফির পরিভাষায় "মাল" সেই জিনিস, যা সংরক্ষণ (Preserve) করা সম্ভব,

---

[১] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখতিরা ওয়াত-তালীফ ফিল ফিকহিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ৩৩১

[২] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখতিরা ওয়াত-তালীফ ফিল ফিকহিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ২৩৮-২৪২

অর্থাৎ তা অবশ্যই কোনো বস্তুগত জিনিস হতে হবে। সে হিসেবে 'জ্ঞান' (ইলম) মাল নয়। মালিকিদের মতে "মাল" বলতে বোঝায় এমন কিছু, যার ওপর মালিকানা (Ownership) প্রতিষ্ঠা করা যায়। শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাবের মতে "মাল" হলো এমন জিনিস, যার দ্বারা উপকার (Benefit) অর্জিত হয়।[৩]

সুতরাং, "সম্পদ" (مال) বলতে যা-ই বোঝানো হোক না কেন, জ্ঞান (علم) এবং সম্পদ—এই দুই জিনিস কখনও এক হতে পারে না। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, যখন ত্বালূত আলাইহিস সালামকে বনী ইসরাঈলের খলীফা তথা বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত করা হলো, তখন বনী ইসরাঈল আপত্তি জানালো, "তার তো কোনো ধন-সম্পদ নেই!", এর জবাবে আল্লাহর নবী শামুয়েল আলাইহিস সালাম বললেন, "ধন-সম্পদ না থাকলেও ক্ষতি নেই, আল্লাহ তো তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।"[৪] আরও বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন কোনো সম্পদ মানুষের উপকারে আসবে না।[৫] কিন্তু জ্ঞান উপকারে আসবে, যেমন কুরআনে ঘোষিত হয়েছে—"আল্লাহ তাআলা আলিমদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।"[৬] অন্যত্র আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, যে সম্পদ জমা করে রাখে এবং একে একে তা গুনে দেখে।[৭] এখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়—কুরআনের দৃষ্টিতে 'মাল' বলতে এমন কিছুকে বোঝায়, যা সংগ্রহ ও গোনা সম্ভব। তাই ইলম সেই অর্থে 'মাল' হতে পারে না।

---

[৩] আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, মতাবি দারুস-সফওয়াহ, মিসর, ৩১/৩২-৩৬

[৪] সূরা আল-বাকারা, ২:২৪৭

[৫] সূরা আশ-শুআরা, ২৬:৮৮

[৬] সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮:১১

[৭] সূরা আল-হুমাযাহ, ১০৪:২

ইলমকে মাল প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টায় অনেকে সেই হাদীসটিকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন দরিদ্র সাহাবীর জন্য তাঁর মুখস্থ সূরাকে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করে তাঁকে বিয়ের করিয়ে দেন।[৮] এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কিছু আলিমের মত হলো, স্বামীর কাছে সম্পদ না থাকলে বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ধরনের উপকারকে মোহর হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ, সম্পদহীনতা ব্যতীত এটি সাধারণ নিয়ম নয়।[৯] হানাফি ও মালিকি মাযহাবের মাশহুর রায় এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহর একটি বর্ণনা মতে, নারীকে কুরআন মুখস্থ করানোকে মোহর নির্ধারণ করা বৈধ নয়; কারণ নারীর লজ্জাস্থান (বিবাহের মাধ্যমে উপভোগের অধিকার) শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে হালাল হয়।[১০] [১১] আরেকদল আলিমের মতে, যে কোনো উপকার বা পরিষেবা—যেমন কুরআন শিক্ষা, সেলাই, লেখালেখি ইত্যাদি যদি কোনো হারাম বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়, তবে ইজারাহ (ভাড়া/পারিশ্রমিক) হিসেবে নির্ধারণ করা বৈধ; সুতরাং তা মোহর হিসেবেও শর্তসাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য।[১২] অতএব আলোচ্য হাদীসটিতে কুরআন শেখানোর বিনিময়কে মোহর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এ হাদীস দ্বারা ইলমকে মাল হিসেবে প্রমাণ করা যায় না।

যেহেতু ইলম ধন-সম্পদ নয়, তাই এটি বিক্রি করাও বৈধ নয়। তবে ইলম প্রদান বা শিক্ষাদানের ‘পরিষেবার মূল্য’ হিসেবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ—

---

[৮] আল-জামিউল মুসনাদুস-সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি— সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাদ্বা-ইলিল কুরআন, বাবু ক্বিরাআতি আন যহ্‌রি ক্বলব, দারু তউকিন নাজাহ, মিসর, ৬/১০৫

[৯] ফাতাওয়া আল-লাজনাতিদ দা-ইমাহ, সৌদি আরব, ১-১৯/৩৫

[১০] সূরা আন-নিসা, ৪:২৪

[১১] আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাতুল কুয়েতিয়্যাহ, মতাবি দারুস-সফওয়াহ, মিসর, ১৭/৩২৪

[১২] আল-ইক্বনা’ ফি হাল্লি আলফাযি আবী শুজা’, ২/৪২৫

যেমনটি সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, "তোমরা যেসব পারিশ্রমিক গ্রহণ করো, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো কুরআন শেখানোর পারিশ্রমিক।"[১৩] এটি ইলমের মূল্য নয়, বরং তার খেদমতের সম্মানী। পরিশ্রমের নির্ধারিত বিনিময় (معاوضة) আর পরিশ্রমের স্বেচ্ছা পারিশ্রমিক (حق خدمت)—এই দুয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি হলো কোনো সেবার বিনিময়ে দুই পক্ষের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক; যেমন কেউ যখন কোনো কাজ করে এবং তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট বেতন গ্রহণ করে। দ্বিতীয়টি এমন কোনো নির্ধারিত বিনিময় নয়। বরং, কেউ কাউকে সেবা দিয়েছে, আর সেই সেবার প্রতিদানস্বরূপ তাকে যা কিছু দেওয়া হয় সে তা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে। এখানে কোনো পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি থাকে না, থাকে কেবল খেদমতের কদর ও সম্মান।

এই কারণেই ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ 'সহীহ বুখারী'তে উপরোক্ত হাদীসের আগে ইমাম শা'বী রহিমাহুল্লাহর এই বক্তব্য এনেছেন—"শিক্ষক যেন আগেভাগেই পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করেন; সদিচ্ছায় তাকে যা দেওয়া হবে, তিনি তা-ই গ্রহণ করবেন।"[১৪] এই রেওয়ায়েতের পটভূমিতে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী সফরে বের হয়ে আরবের এক গোত্রের কাছে শিবির স্থাপন করেন এবং সাহাবায়ে কেরাম আতিথ্য চাইলে তারা আতিথেয়তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরপর সেই গোত্রের প্রধানকে বিচ্ছুর দংশন করলে লোকেরা তার আরোগ্যের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা

---

[১৩] আল-জামিউল মুসনাদুস-সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি—সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইজারাহ, বাবু মা ইউতা ফির রুকইয়াহ আলা আহইয়াইল আরাবি বিফাতিহাতিল কিতাব, দারু তউকিন নাজাহ, মিসর, ৩/৯২

[১৪] প্রাগুক্ত

সাহাবীদের কাছে গিয়ে বলে, "হে যাত্রীদল! আমাদের প্রধানকে বিচ্ছু দংশন করেছে। আমরা সব রকম চেষ্টা করেছি, তবুও কোনো সুফল পাইনি। আপনাদের কারো কাছে কিছু আছে কি?" সাহাবীদের একজন উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা আশা করেছিলাম তোমরা আমাদের অতিথিসেবা প্রদান করবে, কিন্তু তোমরা তা করোনি। তাই যতক্ষণ না আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ আমি তোমাদের নেতাকে ঝাড়-ফুঁক করব না।" পরিস্থিতি বুঝে তারা এক পাল বকরি চুক্তির শর্তে তাঁর সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছায়। এরপর সাহাবী সূরা ফাতিহা পাঠ করে তার উপর ফুঁ দিতে শুরু করলে লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর তারা প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক পুরোপুরি পরিশোধ করে দেয়।[১৫]

সুতরাং যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায় তবে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে কোনো সমস্যা নেই। আর পূর্ব নির্ধারিত এই ধরণের সেবার চুক্তিকে ইসলামি পরিভাষায় "جعالة" (জু'আলাহ) বলা হয়। তবে যা কিছু ফরযের সাথে সম্পর্কিত তার জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় না, বরং স্বেচ্ছা পারিশ্রমিক ধার্য হয়।

কপিরাইট নিয়ে আলিমদের অভিমত

সমকালীন যুগের অধিকাংশ আলিম কপিরাইটের বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন—যেমন, মুফতি নিযামুদ্দীন (দারুল উলুম দেওবন্দ), শায়খ বকর আবু যায়েদ, মুফতি তাকি উসমানী, শায়খ মুস্তফা আয-যারকা, শায়খ ওয়াহবা আয-

১৫ আল-জামিউল মুসনাদুস-সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি—সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইজারাহ, বাবু মা ইউতা ফির রুকইয়াহ আলা আহইয়াইল আরাবি বিফাতিহাতিল কিতাব, দারু তউকিন নাজাহ, মিসর, ৩/৯২-৯৩

যুহাইলী, শায়খ ইউসুফ আল-কারযাভী, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি ও প্রমুখ।[১৬] অন্যদিকে, যাঁরা কপিরাইটকে অবৈধ মনে করেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—মুফতি মুহাম্মাদ শফী, মুফতি আবদুস সালাম চাটগামী, শায়খ আবদুল আযীয বিন বায, শায়খ আহমাদ আল-হাজ্জী আল-কুর্দী, শায়খ তাকীউদ্দীন নাবাহানী, শায়খ মুহাম্মাদ আল-হামীদ, শায়খ সালিহ আল-লুহাইদান, শায়খ মুকবিল ইবনু হাদী আল-ওয়াদী, শায়খ আবুল ইয়ামান আদনান ইবনু হুসাইন আল-মাসকারী, শায়খ ইয়াহইয়া ইবনু আলী আল-হাজুরী ও প্রমুখ।[১৭]

এ কথা ঠিক যে কিছু প্রভাবশালী আলিমও কপিরাইটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এর একটি কারণ হলো এটি সমাজে عرف (রেওয়াজ) আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, আইন প্রণীত হয়ে যাওয়ার কারণে বিষয়টি আরও দৃঢ় হয়েছে। সাধারণত যখন কোনো বিষয়ে আইন প্রণীত হয়ে যায়, তখন আলিমগণ আর তেমন বিতর্কে প্রবেশ করেন না। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশে বিবাহ-তালাক সম্পর্কিত বহু আইন প্রণয়ন হয়েছে, যদিও সেগুলোর অনেকটাই শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারপরও এসব আইন অনুযায়ীই কাজ চলছে, এবং খুব কমই কেউ এর বিরোধিতা করে। যেমন, বাংলাদেশে তালাক সম্পর্কিত যে আইন প্রচলিত আছে, তা কখনও হানাফিদের মতে সঠিক নয়, কখনও সালাফিদের মতে সঠিক নয়, কখনও আবার উভয়ের মতেই সঠিক নয়; তবুও আইন চালু আছে এবং কার্যকর হচ্ছে। একইভাবে কপিরাইট সম্পর্কেও যখন আইন তৈরি হয়ে গেছে, তখন আলিমদের মধ্যেও

---

[১৬] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখ্‌তিরা ওয়াত্‌-তালীফ ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ২৩৮-২৩৯

[১৭] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখ্‌তিরা ওয়াত্‌-তালীফ ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ২৪১

এক ধরনের নীরবতা চলে এসেছে। প্রতিরোধ কেবল অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।

জামিয়া বানূরি টাউনের একটি অনলাইন ফাতাওয়ায় কপিরাইটকে অবৈধ বলা হয়েছে।[১৮] ভারতের বেরেলভী আলিমদের সংগঠন 'শরঈ কাউন্সিল অব

---

[১৮] **প্রশ্ন:** ইন্টারনেটে অনেক ইসলামি বই প্রকাশকদের অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন বই কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা বা পড়া কি জায়েয হবে? অনুগ্রহ করে জানিয়ে বাধিত করুন। **জবাব:** দীনী বিষয়ে লেখা কিতাবসমূহ, যেমন দীনী কিতাব, ফাতাওয়া ইত্যাদি—এগুলোর উপর লেখক বা প্রকাশকের মালিকানা রয়্যালটি, ইজারা বা বিক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা শরীয়তসম্মত নয়। তাই লেখকের অনুমতি ছাড়াও ইসলামী কিতাবসমূহ ইন্টারনেটে আপলোড করা এবং কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা বৈধ। এই বিষয়ে অধিকতর ও গভীরভাবে জানতে فتاوی بینات—দ্বিতীয় খণ্ড, كتاب المعاملات, ১২৪ থেকে ১৩১নং পৃষ্ঠা পাঠের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। আল্লাহই ভালো জানেন। ফাতাওয়া নাম্বার: 143705200006
https://www.banuri.edu.pk/readquestion/مصنف-کی-اجازت-کے-بغیر-کتابیں-اپ-لوڈ-کرنا/2016-02-13
বি.দ্র.: উপরোক্ত ফাতাওয়ায় বিস্তারিত জানতে 'ফাতাওয়া বাইয়্যিনাত'-এর দ্বিতীয় খণ্ড দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে; এখানে সামান্য ত্রুটি হয়েছে। কারণ, এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। সঠিক তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট খণ্ডটি পর্যালোচনা করাই শ্রেয়। তবুও পাঠকদের সুবিধার্থে সেই ফাতাওয়াটি সম্পূর্ণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:
প্রশ্ন: মহোদয়, মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার সাহেব দামাত বারাকাতুহুম, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আশা করি আল্লাহ তা'আলার রহমতে ভালো আছেন। আপনার সাথে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ফোন ক্রমাগত ব্যস্ত পাচ্ছিলাম। এখন চিঠি লিখতে বসেছি আর আপনার সাথে ফোনে কথা হয়ে গেল। এই চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি শাহেদ সাহেবকেও জানিয়েছি, আশা করি আপনি মনোযোগ দেবেন। এই চিঠির উদ্দেশ্য নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে: ১. কুরআনুল কারীম (অর্থ বা ব্যাখ্যা ছাড়া) মুদ্রণ এবং এর কপিরাইট সংরক্ষণ। ২. ধর্মীয় বইয়ের হাদিয়া (মূল্য) আসল দামের চেয়ে ৩ বা ৪ গুণ বেশি রাখা। ক. জনাব মাওলানা সাহেব! আমি বাজারে দেখেছি, এবং সম্ভবত আপনারও জানা আছে যে, কুরআনুল কারীম ছাপিয়ে বাজারে ছাড়া হয় এবং এর হাদিয়া অনেক বেশি রাখা হয়, আর সাথে কপিরাইট সংরক্ষণ করা হয়। এটা কতটুকু সমীচীন? কারণ একদিকে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমার এই কালামকে ছড়িয়ে দাও, আর একই সাথে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, এর জন্য তাদের কাছ থেকে কোনো প্রতিদান নিও না, বরং এর প্রতিদান আমিই দেবো। এটা কি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন নয়? দ্বিতীয়ত, কপিরাইট সংরক্ষণ ছাড়াও

মধ্যস্বত্বভোগীর হাদিয়া ৫০ টাকা হয়। "আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন।" (সূরা শু'আরা: ১০৯) খ. অনুরূপভাবে, যদি কেউ অনুবাদ করে বা অন্য ভাষায় রূপান্তর করে, সেক্ষেত্রেও একই অবস্থা—হাদিয়া নির্ধারিত হয় অত্যন্ত উচ্চমাত্রায়, অথচ কুরআন ও হাদীসসমূহে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এ বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, আপনি যদি রাশিয়া, চীন, হল্যান্ড বা আমেরিকাতেও যান, তবে সেখানেও সংশ্লিষ্ট জনগণের ভাষায় অনুবাদ রচিত হবে। সুতরাং, নির্দেশ হলো তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার; অথচ সেখানে এমন মাত্রার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হয় যেন এটি কেবল নিছক আমাদের পরিশ্রম মাত্র। এ বিষয়েও আপনি অনুগ্রহ করে বলবেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বৈধতা কতটুকু? ২. ধর্মীয় বই নিয়েও এক ধরনের ফাজলামো প্রচলিত আছে, তা হলো ৩০ টাকায় ছাপানো একটি বইয়ের হাদিয়া নির্ধারণ করা হয় ৭০ কিংবা ৮০ টাকা। বাস্তবতা হলো, যে বইটি কিনতে চাইবে, সে ৭০ বা ৮০ টাকার কমে তা পাবে না। যদিও প্রকাশক বই বিক্রেতাকে ৩০% কমিশন প্রদান করে এবং লেখকের কপিরাইটও সংরক্ষিত থাকে, তথাপি এই বিপুল পরিমাণ মুনাফা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। আমরা দীন প্রচার করছি নাকি দীনকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছি, যেন দরিদ্র শ্রেণী—যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রায় ৭৫%) তারা তা কিনতেই না পারে! অতঃপর প্রত্যেকে মুখে মুখে শোনা কথার ভিত্তিতেই আমল করতে থাকে, আর ফাতাওয়া জারি হয়—সে নিজেই দায়ী! বোঝা দুষ্কর, এই জটিলতার অবসান আসলে কিভাবে সম্ভব? আপনি হয়তো জানেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে যতটা পারি চেষ্টা করে যাই। কিন্তু এসব জিনিস মাঝেমাঝেই পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এখন এ ব্যাপারে আপনি আমাকে অবশ্যই দিকনির্দেশনা দিন—আমি কী করব? আমি তো একজন দুনিয়াদার মানুষ, শরঈ মাসআলা ঠিকমতো বুঝি না। কিন্তু যখন এসব দৃশ্য দেখি, তখন মনটা খুব অস্থির হয়ে ওঠে—আল্লাহকে আমি কী জবাব দেব? কুরআনুল কারীমে তো বারবার এ কথাই বলা হয়েছে: "হে আমার কওম! আমি এ কাজে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো কেবল তাঁর কাছেই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি বুঝো না?" (সূরা হুদ: ৫১) আর সূরা মু'মিনুনের ৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তুমি কি তাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাও? অথচ তোমার রবের প্রতিদানই তো শ্রেষ্ঠ, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।" এই কথাগুলো তো খাঁটি দীনী বোঝাপড়ার ফল। আমি আশা করি, আপনি এ বিষয়ে আমাকে স্পষ্টভাবে বলে দিক দেখাবেন। এবার আমি আপনার দৃষ্টি বিদেশের পরিস্থিতির দিকে আকর্ষণ করাতে চাই। আমি সেখানে যা দেখেছি তা হলো, যে কিতাবের স্থানীয় হাদিয়া ধরা হয় ৩০ টাকা, সেটিই বিদেশে পৌঁছে গিয়ে ৬০ থেকে ৯০ টাকায় বিক্রি হয়। অর্থাৎ দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। অথচ ওই কিতাবটি তো মূলত প্রকাশকের ঘরে পড়ে থাকা একই বই। মা'আরিফুল কুরআনের ইংরেজি সংস্করণের কথা যদি বলি—আলহামদুলিল্লাহ, এটি এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তাফসীর যা ইংরেজি ভাষায় প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণরূপে রচিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, তা পিকথালের অনুবাদ হোক কিংবা আল্লামা ইউসুফ আলী অথবা মওদূদী সাহেবের কাজ, সেগুলোর সঙ্গে এ তাফসীরের পার্থক্য হলো, এতে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক ফুটনোটও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি এই মা'আরিফুল কুরআন কিছু ছাড়

দিয়ে বিতরণ করা হতো, তবে সেই সমস্ত মানুষ—যারা কেবল ইংরেজি জানে, তারা বিশেষভাবে উপকৃত হতো। অথচ এই কিতাব বিদেশে পৌঁছালে তার হাদিয়া ২৫-এর নিচে হয় না। আমি আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই। মা'আরিফুল কুরআনের উর্দু সংস্করণের (৮ খণ্ড) যুক্তরাজ্যে সর্বনিম্ন হাদিয়া নির্ধারিত ছিল ৬০ পাউন্ড। অথচ আমরা সেটি সেখানে ১৮ থেকে ২০ পাউন্ডে সরবরাহ করেছি। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ১৫০০ সেট পাঠানো হয়ে গেছে। আপনি বিশ্বাস করুন, সেখানকার ছাত্ররা যখন নিজেদের জন্য একটি করে সেট পেল, তাদের আনন্দ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তারা কতটা উৎসাহিত। আগে তারা তিনজন মিলে একটি সেট কিনতো! এই অভিজ্ঞতা থেকেই আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন, সেখানে কুরআনুল কারীম ও দীনী কিতাবের প্রতি মানুষের আগ্রহ কতটা গভীর। আমি আপনার নিকট হাত জোড় করে বিনীত অনুরোধ করছি, আপনি দীনী কাজের ক্ষেত্রে আমাকে পথ দেখান, দিকনির্দেশনা দিন। এ আমার জন্য পরম সৌভাগ্য ও আপনার পক্ষ থেকে বড় দয়া হবে। প্রশ্নকর্তা: আলতাফ হুসাইন বারখোরদারিয়া

জবাব: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। কপিরাইট প্রসঙ্গে শুরুতেই স্পষ্ট করা দরকার—লেখনীমূলক সৃষ্টি মূলত দুই ধরনের: ১. পার্থিব বিদ্যা ও শিল্পকলাভিত্তিক রচনা, যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য ইত্যাদি। ২. শুধু দীনী জ্ঞাননির্ভর রচনা, যেমন তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইসলাহি প্রবন্ধ। আমাদের প্রশ্ন দ্বিতীয় শ্রেণির বইপত্র ঘিরে; তাই উত্তরও ওই শ্রেণির কপিরাইট সম্পর্কে সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট সংরক্ষণ বা বিক্রি নিয়ে অধিকাংশ প্রাচীন আলিমের রায়: নাজায়েয (অবৈধ), অধিকাংশ সমসাময়িক আলিমের রায়: জায়েয (বৈধ)। আমাদের উদ্দেশ্য 'হক্কে মুজাররাদা' নাকি 'হক্কে মুওয়াক্কাদা' বিতর্কে প্রবেশ নয়; বরং একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ। জায়েযপন্থীদের মতে, কপিরাইট আজ আর অমূর্ত নয়, সরকারি নিবন্ধনের ফলে এটি আর্থিক সম্পদে রূপ নেয়; সুতরাং তা হস্তান্তর করে বিনিময় নেওয়া বৈধ। (দলিল: মাওলানা তাকী উসমানী, ফিকহী মাকালাত) এই দৃষ্টিতে তাঁরা কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, ফাতাওয়া ইত্যাদি শুদ্ধ দীনী গ্রন্থকেও পার্থিব জ্ঞানশিল্প ও আর্থিক উপার্জনের কাতারে ফেলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তাঁদের মাত্র দু'টি বক্তব্য নিচে উল্লেখ করছি কোনো আলোচনা ছাড়াই: ১. জ্ঞান, শিল্প ও কারিগরির সমুদ্রে সবার ডুব দেওয়ার অধিকার রয়েছে। যদি কেউ মেধা ও শ্রম দিয়ে গবেষণা-গ্রন্থ রচনা বা কোনো আবিষ্কার করে সেটাকে মূল্যবান বানান, তবে তিনি ঐ সমুদ্র থেকে একটি অংশ আলাদা করে নিয়েছেন; সুতরাং সেটার মুনাফাও তারই হবে। [জাদীদ ফিকহী মাবাহিস, "বায়'উল হুকুক" (মাওলানা মুহাম্মদ তাইয়্যেবুর রহমান, আমীরে শরীয়ত আসাম; ইদারাতুল কুরআন, করাচি, পৃ. ৩০৭/৩)] ২. মুদ্রণ প্রযুক্তি ও আধুনিক শিল্প সরঞ্জাম আবিষ্কারের আগে কপিরাইটের ধারণাই ছিল না। সেই সময়ে যাঁরা সৃজনশীল কাজ করতেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল খেদমত; বাণিজ্যিক লক্ষ্য সামান্যও জড়িত ছিল না। তখন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না, কাজেই আর্থিক লাভের প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্ন, জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যও জুড়ে গেছে। [মাকালাতে মাওলানা রফীকুল মান্নান আল কাসেমী ৩/৩২৯ প্রকাশনায়: ইদারাতুল কুরআন।] হযরত মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সূক্ষ্ম মাসআলাটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, কপিরাইট

রক্ষার পেছনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মূলত আর্থিক লালসা ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। তিনি তাঁর জাওয়াহিরুল ফিকহ নামক কালজয়ী গ্রন্থে লিখেছেন: "যদি বিশ্ব-বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আজকের পুঁজি-নেশাগ্রস্ত সভ্যতায় একদিকে যেমন গরীবের মুখে সন্তুষ্টির হাসি অনুপস্থিত, তেমনি ধনীর হৃদয়েও প্রশান্তির ছায়া নেই। প্রতিদিন বৈধ-অবৈধ হাজারো পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে কেবল বিত্তের মোহে। আর এ অবস্থার পেছনে এক বড় কারণ এই যে, ইসলাম যেসব উপার্জনের উৎসকে 'ওয়াকফ' করে দিয়েছিল সাধারণ মানবতার জন্য, যেসব ছিল সমাজের সম্মিলিত অধিকার, লোভাতুর শাসকশ্রেণী এবং তাদের দোসররা একে তো সেগুলোকে নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে, নয়তো বাজারের ঠাণ্ডা নিলামে তুলে দিয়েছে। এখন ট্যাক্স দিলেই যেন সেই পবিত্র সম্পদের মালিক বনে যাওয়া যায়!" (জাওয়াহিরুল ফিকহ - কপিরাইট এবং পেটেন্ট রাইটের শরয়ী মর্যাদা ২/৩৩৭ প্রকাশনায়: মাকতাবা দারুল উলূম করাচী) যদি হযরতের এই গভীর উপলব্ধিকে সামনে রেখে বর্তমান 'ধর্মব্যবসা'র বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে পরিস্কার বোঝা যায়—তাফসীর, হাদীস, ফিকহ কিংবা ফাতাওয়ার মতো শুদ্ধ দীনী জ্ঞানরূপ বইপত্রকে কীভাবে কিছু ব্যক্তি পার্থিব গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার পর্যায়ে নামিয়ে এনে আর্থিক মুনাফার পণ্যে রূপান্তর করতে ব্যস্ত। এমনকি, হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলেছিলেন: "আলিমের শাস্তি হলো তাঁর অন্তরের মৃত্যু।" জিজ্ঞাসা করা হলো: "হে ইমাম, অন্তরের মৃত্যু কী?" উত্তরে বললেন: "আখেরাতের আমলের দ্বারা দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করা।" কুরআন শিক্ষা, ইমামতি, দারস ইত্যাদি যেসব বিশুদ্ধ দীনী কাজ ইসলামের স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য, সেসব কাজকে যুগের প্রয়োজন ও মুসলিম উম্মাহর দুরবস্থার কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইস্তি'জার (ভাড়ায় নিয়োগ)-এর ফাতাওয়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ফাতাওয়া থেকে সুযোগ নিয়ে কপিরাইটের নামে ধর্মীয় গ্রন্থ বিক্রি করে বিপুল অর্থোপার্জন জায়েয বলে চালিয়ে দেওয়া এবং পুস্তক রচনাকে 'রয়্যালটি' নামে ভাড়ায় দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। ইমামত না থাকলে যেমন দীনের স্থায়িত্ব বিপন্ন, গ্রন্থ থেকে নতুন নিকাত (নতুন দৃষ্টিভঙ্গি) বের করা বা পুরোনো কথা সহজে বোঝানো সেরকম অপরিহার্য নয়। এ কারণেই যেমন তারাবিহ পড়ানো কিংবা ইসালে সওয়াবের কুরআন খতমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া 'অনাবশ্যক' ধরে নাজায়েয গণ্য হয়েছে, ঠিক তেমনি দীনী কিতাবেও অতি মুনাফার প্রবণতা শরীয়সিদ্ধ হতে পারে না। লেখক নিজের মননশক্তি ও মেধা দিয়ে জ্ঞান-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে যে মুক্তো সংগ্রহ করেছেন, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি, সত্য দীনের প্রচার এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং কপিরাইটের দাবি তুলে এ জ্ঞানের অবাধ প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন? ধর্মীয়, সংস্কারমূলক ও দাওয়াতি রচনার কারণে লেখকের দায় তো শুধু গ্রন্থের মালিকানা অবধি সীমাবদ্ধ নয়; সত্যকে সুস্পষ্ট করে তোলা এবং সবাইকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়াই তাঁর বড় দায়িত্ব। আর সত্য গোপন করাও বৈধ নয়, আবার দীনী ইলম প্রচার ও সংশোধনের কাজে উপকারী বিষয় আটকে রেখে "مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ" তথা কল্যাণের কারিগর হওয়াও বৈধ নয়। যে লেখক দিনরাত কঠোর পরিশ্রমে কোনো গ্রন্থ রচনা করেন, তা তাঁর জন্য সাদকায়ে জারিয়া। কিয়ামতের মাঠে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে দানশীলতার উচ্চ মর্যাদা লাভ

করবেন, একাকী একটি উম্মতস্বরূপ দাঁড়াবেন; তাঁর ফযিলত হবে সেই সিয়াম-কিয়ামকারী আবিদের উপর, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "كَفَضْلِي على أَدْنَاكُم"—"যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর।" অন্যদিকে, কপিরাইটের নামে জ্ঞান আটকে রাখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কবার্তা স্মরণ করায়: " مَثَلُ عِلْمٍ لا يُنْتَفَعُ بِهِ كمثل كنزٍ لا يُنْفَقُ منه في سبيل الله"—"যে জ্ঞান থেকে উপকার নেওয়া হয় না, তা সেই ধনভাণ্ডারের মতো, যা আল্লাহর পথে ব্যয় হয় না।" আর কুরআনের কঠোর হুঁশিয়ারি: " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ"—"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে আর আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদের শোনাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ।" ধর্মীয় গ্রন্থকে যদি নিছক পার্থিব লাভের পণ্যে পরিণত করা হয়, তবে ভয় করতে হবে সেই ভয়াবহ সতর্কতার: "لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ"—"কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না" আর কুরআনি তিরস্কার: "يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً"—"তারা আল্লাহর বাণীর বিনিময়ে সামান্য মূল্য কেনে।" যদি কোনো প্রকাশক নিছক ব্যবসায়ী-মনা হন, তিনি তার সজ্জা ও মুদ্রণ-ব্যয় বাবদ ন্যায্য পারিশ্রমিক চাইতে পারেন; তবে তা যেন শোষণের পর্যায়ে না পৌঁছে। আজকাল যেমন বইয়ের প্রকৃত খরচের কয়েকগুণ দামে বিক্রি করা হয়, মধ্যস্বত্বভোগীকে অতিরিক্ত মুনাফা দিয়ে পাঠককে চাপে ফেলা হয়, এ ধরনের ফাহিশ মূল্যবৃদ্ধি ও যুলুমের অনুমোদন শরিয়ত দেয় না। সারকথা—খাঁটি দীনী কিতাবকে রয়্যালটি-চুক্তিতে ভাড়া দিয়ে বা কপিরাইট আটকে রেখে আয় করা বৈধ নয়। ক. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মৃত্যুর পর মানুষের সব আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া: (১) সাদকায়ে জারিয়া, (২) এমন জ্ঞান যা থেকে উপকার নেওয়া হয়, (৩) নেক সন্তান, যে পিতা-মাতার জন্য দুআ করে।" [মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ইলম, প্রথম পরিচ্ছেদ, ১/৩২] খ. আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "সবচেয়ে দানশীল কে জানো?" সাহাবারা বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা; তারপর আমি, আর আমার পরে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে জ্ঞান অর্জন করে ও তা ছড়িয়ে দেয়, কিয়ামতের দিন সে এক উম্মতরূপে উঠবে।" [প্রাগুক্ত, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, ১/৩৬] গ. হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ মুরসাল সুত্রে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দুই বনি ইসরাঈলের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ছিল? একজন আলিম—যিনি ফরয নামায পড়ে মানুষকে কল্যাণ শেখাতেন, আরেকজন আবিদ—যিনি দিনে রোযা রাখত ও রাতে নামাযে মগ্ন থাকত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সেই আলিমের মর্যাদা সেই আবিদের তুলনায় এমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির তুলনায়।" [প্রাগুক্ত] ঘ. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যে জ্ঞান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আবশ্যক, কেউ যদি তা দুনিয়ার সামান্য পাথেয় লাভের জন্য অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" [প্রাগুক্ত ১/৩৪]

লিখেছেন: মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মাজীদ দীনপুরী (বায়্যিনাত, জমাদিউস সানি ১৪১৮ হি.)

অনুমোদন করেছেন: মুফতী মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী

ইন্ডিয়া'-এর সপ্তম ফিকহি সেমিনারে কপিরাইটকে অবৈধ বলেই ঘোষণা করা হয়েছে।[১৯]

প্রশ্ন: বইয়ের রয়্যালটি নেওয়া এবং দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? প্রকাশক বইয়ের কম্পোজিং থেকে ছাপানো পর্যন্ত সমস্ত খরচ নিজে বহন করেন, তবে প্রত্যেক সংস্করণ ছাপার পর বিক্রি হোক বা না হোক, তিনি নির্দিষ্ট হারে লাভের একটি অংশ লেখককে দিতে বাধ্য থাকেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক নিজে কম্পোজ করিয়েও দেন—এ অবস্থায় রয়্যালটির শরঈ হুকুম কী হবে? **জবাব:** এ কথা স্পষ্টভাবে জানা উচিত যে, কোনো পাণ্ডুলিপি নিজের মালিকানায় রেখে শুধুমাত্র মুদ্রণাধিকার বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কারণ, মুদ্রণাধিকার এমন কোনো মাল নয়, যা বিক্রয়যোগ্য হতে পারে। সুতরাং, মুদ্রণাধিকারকে কেন্দ্র করে যেকোনোভাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। একইভাবে, বইকে রয়্যালটির ভিত্তিতে বাৎসরিক অথবা সংস্করণভিত্তিক ছাপানোর জন্য দেওয়াও বৈধ নয়। আল্লাহই ভালো জানেন। ফাতাওয়া নাম্বার: 144001200752

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/کتاب-کے-مسودہ-کو-رائلیٹی-پر-لینا-دینا-حق-طباعت-کی-بیع-کا-حکم/2018-10-28

প্রশ্ন: কিছু সমসাময়িক বই আছে যেগুলোর কপিরাইটের অনুমতি দেওয়া হয় না; আমরা সেগুলোর সেকেন্ড কপি কম দামে পাই। এগুলো কেনা কি বৈধ? **জবাব:** বইকে রয়্যালটির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সঠিক নয়; অতএব লেখকের অনুমতি ছাড়াও সেকেন্ড কপি কেনা বৈধ। কারণ যে কপি সিডি, ইন্টারনেট বা দোকানে সরবরাহ করা হচ্ছে, তা ওই নির্মাতা বা প্রকাশকের মালিকানার অংশ হিসেবে গণ্য হয় না। আল্লাহই ভালো জানেন। ফাতাওয়া নাম্বার: 144103200177

https://www.banuri.edu.pk/readquestion/سوفٹ-وئیر-کاپی-کرنا-اور-کتاب-کی-سیکنڈ-کاپی-لینا-06/2019-11-144103200177

[১৯] **কপিরাইট, পেটেন্ট এবং মেধা সম্পত্তির অধিকারের ক্রয়-বিক্রয়:** আলিম সমাজ এবং ফিকহ ও ফাতাওয়া প্রদানকারীদের কাছে এটা অজানা নয় যে, বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয় এবং বিভিন্ন প্রকার লেনদেনের নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে কত এমন জিনিসকে মূল্যবান সম্পদ ও অর্থ-সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে ফিকহে হানাফির দৃষ্টিকোণ থেকে মালের সংজ্ঞার আওতায় আসে না। কারণ ফিকহের কিতাবে বিক্রয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: "مبادلة المال بالمال بتراضي الطرفين" (পারস্পরিক সম্মতিতে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান) (হিদায়া ২/৩)। আর মালের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা শামী লিখেছেন: " المراد بالمال ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية تثت بتمول الناس كافة او بعضهم " "মাল বলতে এমন জিনিসকে বোঝায় যার প্রতি মানুষের স্বভাবের ঝোঁক থাকে এবং প্রয়োজনের সময় যা সঞ্চয় করা যায়; আর এর মূল্য সর্বসাধারণের বা কিছু মানুষের কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।" (শামী ৩/৪)। মালের উপরোক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মালকে মজুদযোগ্য ও বস্তুগত হওয়া আবশ্যক। এই

কারণেই ফিকহের কিতাবে হক্কে তা'লি (ছাদের উপর নির্মাণ অধিকার), হক্কে শুরব (পানির অধিকার), হক্কে তাসহিল (সহজ করার অধিকার) ইত্যাদি অধিকারের ক্রয়-বিক্রয়কে নাজায়েয বলা হয়েছে, কারণ এগুলোর মুনাফা বস্তুগত নয়। কিন্তু একই সাথে কিছু কিছু অধিকার, যেমন হক্কে মুরুর (চলার পথের অধিকার) বিক্রয়ের বৈধতাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। যেমন হিদায়ায় আছে: "যদি নিচের তলা (ভবনের ভিত্তি বা গ্রাউন্ড ফ্লোর) এক ব্যক্তির হয় এবং তার উপরের তলা (দোতলা) অন্য কারও মালিকানায় থাকে, অতঃপর পুরো ভবন বা শুধুমাত্র উপরের তলা ভেঙে পড়ে—এ অবস্থায় যদি উপরের তলার মালিক তার সেই উপরের তলা বিক্রি করতে চায়, তবে তা বৈধ হবে না..." (হিদায়া ৩/৪০)। অতীতে ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে যে সকল অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: হুকুকে মুজাররাদা (বিমূর্ত অধিকার) এবং হুকুকে মুয়াক্কাদা (সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকার)। কিছু কিছু অধিকারের বিক্রি বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে সেগুলোর মালিকানা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়েও বিস্তারিত লেখা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এই অধিকারগুলো ছাড়াও আরও কিছু অধিকারের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন হয়েছে এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে কেনাবেচা হচ্ছে, যেমন হক্কে তাসনীফ (প্রকাশনার অধিকার বা কপিরাইট), হক্কে ইজাদ (উদ্ভাবনের অধিকার বা পেটেন্ট), হক্কে তাহকীক (গবেষণার অধিকার) ইত্যাদি। আলিমগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, হকের দুটি প্রকার রয়েছে: প্রথমত, হক্কে মুয়াক্কাদ, যা হক্কে সাবিত (প্রতিষ্ঠিত অধিকার) ও হক্কে মুতাকাররার (স্থিরীকৃত অধিকার) নামেও পরিচিত। দ্বিতীয়ত, হক্কে মুজাররাদ, যা কোনো স্থানে স্থিরীকৃত নয় এবং যার মালিকের কেবল মালিকানার ক্ষমতা থাকে (মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষমতা নয়)। এবং এর প্রমাণ মূলতঃ (أصالةً) হয় না, বরং কেবল ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য হয়ে থাকে। হক্কে মুয়াক্কাদ হলো সেই হক যা কোনো স্থানে স্থিরীকৃত, যার মালিকের মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষমতাও আছে এবং যার প্রমাণ মূলতঃ (أصالةً) বিদ্যমান থাকে, শুধুমাত্র ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য নয়। এই সংজ্ঞা হিদায়া ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি কিতাবের ইবারত থেকে নেওয়া হয়েছে, যা কিতাবুল শুফআতে (অগ্রক্রয়াধিকার) উল্লিখিত আছে। আল্লাহই ভালো জানেন। প্রকাশনার অধিকার, বাণিজ্যিক সুনাম, নতুন আবিষ্কারের অধিকার এবং ঔষধের ফর্মুলা ইত্যাদির মতো অধিকারগুলো কি হুকুকে মুজাররাদা নাকি হুকুকে মুয়াক্কাদা—এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। এই মাসআলায় কয়েকটি মতামত সামনে আসে: ১. প্রথম মত: এগুলো হুকুকে মুয়াক্কাদা, কারণ এগুলো তাসনীফ (রচনা) যা মালের সাথে সম্পর্কিত। এই মতটি মুফতি আনওয়ার নিযামী এবং মাওলানা ফায়যান আল-মুস্তফার ছিল। ২. দ্বিতীয় মত: এগুলো হুকুকে মুজাররাদা, কারণ যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বই ইত্যাদি প্রকাশ করে ব্যবসা করে, তবে তাতে লেখকের ক্ষতি হয়। আর এই অধিকারটি হক্কে শুরব (পানির অধিকার)-এর মতো, যা কোনো মাল বা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নয়। অধিকাংশ প্রতিনিধিদের মত এটাই ছিল। ৩. তৃতীয় মত: মুহাদ্দিস আল্লামা জিয়া আল-মুস্তফা সাহেব এই মত পেশ করেন যে, এটি হক্কে মুয়াক্কাদও নয় এবং হক্কে মুজাররাদও নয়, বরং এটিকে সাধারণ কথোপকথনে 'হক' বলা হয়, যেমন মুবাহ (অনুমোদিত) জিনিসের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা, মসজিদে নামায পড়ার অধিকার—এগুলো না মুয়াক্কাদ আর না মুজাররাদ। ৪. চতুর্থ মত: এই মতটি সামনে আসে যে, এটি হক্কে মুজাররাদ কিন্তু হক্কে

কেউ কেউ, যেমন আবদুল্লাহ বিন বায়াহ এবং আবদুল লতীফ আল-ফারফুর শুধুমাত্র ধর্মীয় রচনার ক্ষেত্রে কপিরাইটকে অসঙ্গত বলে অভিমত দিয়েছেন।[২০] আবার কেউ কেউ, যেমন মুহাম্মাদ নাঈম ইয়াসীন—মধ্যমপন্থার ধারক।[২১]

খেদমতের আঙিনায় স্বার্থের পদচিহ্ন

জ্ঞানের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে না—এই কথাটিই আমাদের মৌলিক বক্তব্য। পশ্চিমা বিশ্ব জ্ঞানের লেনদেনকে আইনি বৈধতা দিয়ে এটিকে ব্যবসার রূপ দিয়েছে। তাই বলে কি আমরা মুসলিমরাও এতটাই অধঃপতিত হয়ে গেছি যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার এবং বস্তুগত পণ্যের ব্যবসার মধ্যকার পার্থক্যই

শুফআ ইত্যাদির চেয়েও দুর্বলতর। এই মতটি হযরত তাজুশ শরীয়াহ পেশ করেছিলেন। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, এটি হক্কে মুজাররাদ। আল্লাহই ভালো জানেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, রচনার প্রকাশনার অধিকার (কপিরাইট) এবং নিজের আবিষ্কারের ফর্মুলা বই বা অন্য কোনো মালের সাথে আনুষঙ্গিকভাবে বিক্রি করা জায়েয। আল্লাহই ভালো জানেন। লেখক ও উদ্ভাবকদের জন্য তাদের রচনা ও আবিষ্কারের রয়্যালটি বই প্রকাশকারী এবং আবিষ্কারের শিল্প ও বাণিজ্যকারীদের কাছ থেকে নির্ধারণ করা ও গ্রহণ করা জায়েয নাকি হারাম? এই বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, যদি লেখক বা উদ্ভাবক উল্লেখিত সংশ্লিষ্টদের ব্যবসার পুঁজি না দিয়ে থাকেন অথবা নিজেরা ব্যবসায় কার্যত অংশ না নিয়ে থাকেন, তবে তা মুদারাবাহও নয় এবং শরীকাত সহীহার (বৈধ অংশীদারিত্ব) কোনো প্রকারের মধ্যেও পড়ে না। এই কারণে রয়্যালটির লেনদেন শরীয়ত অনুযায়ী হারাম ও নাজায়েয। আল্লাহই ভালো জানেন। হযরত আল্লামা তাজুশ শরীয়াহ বলেছেন: "রয়্যালটির ক্ষেত্রে যদি লেখক বলে দেন যে আমি কিছুই নেব না, আর প্রকাশক বলে দেন যে আমি কিছুই দেব না। তারপর পরে নিজের সন্তুষ্টি ও খুশিমনে কিছু দেন, তবে তা নিতে কোনো সমস্যা নেই।" আল্লাহই ভালো জানেন।

http://alahazrat.org/UrduWabesite/seminar07.html

[২০] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখ্‌তিরা ওয়াত্‌-তালীফ ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ২৪১

[২১] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখ্‌তিরা ওয়াত্‌-তালীফ ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ২৪২

ঘুঁচিয়ে দিব? দ্বিতীয়ত, সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।[২২] এর মধ্যে নিঃসন্দেহে দীনী জ্ঞান তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এবং অনেক উলামায়ে কেরাম এতে পার্থিব বিদ্যাবুদ্ধিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৩] যেখানে জ্ঞানার্জন ফরয, সেখানে কীভাবে সম্ভব যে, একজন মুসলিম সেই ফরয পালন তখনই করতে পারবে, যখন তার কাছে সে ফরয পালনের জন্য নির্ধারিত অর্থ থাকবে? অথচ বহু দীনী কিতাব আছে, যেমন কুরআনের তরজমা, হাদীসের গ্রন্থসমূহের অনুবাদ, হাদীসের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা, আকীদা, ইবাদত ও লেনদেন সংক্রান্ত ফিকহি বিধানের গ্রন্থসমূহ— যা ফরয ইলমের আওতায় পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় সালাত আদায় করা কি ফরয নয়? যদি ফরয হয়, তবে "সলাতুন নবী স." নামে যে বই লিখিত হয়েছে, তা তো সে-ই পড়তে পারবে যে বইটি কিনে নিতে সক্ষম, কারণ বইটির লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ থেকে কপিরাইট সংরক্ষিত। অর্থাৎ, কেবলমাত্র মূল্য প্রদান করলেই তা পড়ার অধিকার মিলবে, আর অন্য কোনো পথ নেই। কেউ কি সাহস করে লেখক বা প্রকাশককে এই প্রশ্ন করতে পারবে—বইয়ে উল্লিখিত নামায কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায, না লেখক আর প্রকাশকের নামায? যার স্বত্বাধিকার এখন তাদের হাতে এসে গেছে? যখন নিজেরাই বলছেন এটি "সলাতুন নবী", তখন

---

২২ ইলম অর্জন করা সকলের জন্য ফরয—ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-কাযভিনী, সুনান ইবনু মাজাহ, বাবু ফাদলিল উলামা ওয়াল-হাসসি আলা তলাবিল ইলম, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরবিয়্যাহ, বৈরুত, ১/৮১

২৩ ইমাম ইবনুল ক্বায়্যিম রহ. বলেন, জ্ঞান হলো তা, যা প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আর উপকারী জ্ঞান হলো তা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন, তবে কিছু জ্ঞান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যম ছাড়া অর্জিত হতে পারে, যেমন পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান; যেমন: চিকিৎসা, গণিত, কৃষি এবং ব্যবসা—মিফতাহ দারুস-সাআদাহ, ইবনুল ক্বায়্যিম, ১/১০০-১০২

এর প্রকৃত কপিরাইট তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাস, যা সমগ্র উম্মাহর মাঝে ব্যাপকভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে। তাহলে এটি কীভাবে লেখক বা প্রকাশকের আইনি সম্পত্তি (Intellectual Property) হয়ে গেল?

সুতরাং, এমন যেকোনো আইন বৈধ হতে পারে না, যা দীনী বা দুনিয়াবি ইলমকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে। বরং তা কিতমানে ইলম, অর্থাৎ জ্ঞান গোপন করার একটি ভয়াবহ রূপ। অথচ, আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই জ্ঞান প্রচারের, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্বন্ধিত।[২৪] যার গোপন করাকে গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[২৫] কপিরাইটের দোহাই দিয়ে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্রদের কাছ থেকে ইলম গোপন করে এবং তাদেরকে ফরয দায়িত্ব অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞান কারো একচেটিয়া সম্পদ নয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঘাস, পানি এবং আগুন কারো একক মালিকানাধীন নয়; সবাই এতে সমানভাবে অংশীদার।[২৬] আজ যদি কেউ সহীহ বুখারীর তরজমা প্রকাশ করে এর কপিরাইট দাবি করেন, তাহলে প্রশ্ন হলো—সহীহ বুখারীর মৌলিক কপিরাইট তিনি কোথা থেকে পেলেন? যদি সহীহ বুখারী একটি গ্রন্থ ও মালিকানাধীন সম্পদ হয়, তাহলে এর উত্তরাধিকার তো ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহর পরিবারে চলমান থাকার কথা ছিল। আর উত্তরাধিকার অনুসন্ধান তো কঠিন কাজ নয়, একটি শাজারাহ (পারিবারিক বংশ তালিকা) বের করলেই জানা যাবে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহর উত্তরসূরীরা কারা। ঠিক তেমনি, কেউ যদি একটি সফটওয়্যার ডিজাইন করেন, তাহলে সেখানে যে গাণিতিক সূত্র বা

---

২৪ আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও—সহীহুল বুখারী, কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, বাবু মা যুকিরা আন বানি ইসরাঈল ৪/১৭০

২৫ সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২:১৭৪

২৬ সকল মুসলিম তিনটি বিষয়ে সমান অংশীদার: পানি, তৃণভূমি এবং আগুন—সুনান ইবনু মাজাহ, কিতাবুর রাহুনি, বাবুল মুসলিমূনা শুরাকা ফি সালাস, ২/৮২৬

লগারিদম ব্যবহৃত হয়েছে, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ তিনি কোত্থেকে পেলেন? এমন তো নয় যে সফটওয়্যার ডিজাইনের আগের রাতেই তার ওপর হঠাৎ সমস্ত জ্ঞান নাযিল হয়েছিল। "জিরো" ও "ওয়ান" ব্যতীত কি উইন্ডোজ বা কোনো সফটওয়্যারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়? যদি না যায়, তাহলে যে ব্যক্তি "জিরো" ও "ওয়ান" আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর কি উইন্ডোজ বিক্রির মুনাফা থেকে কোনো অধিকার নেই? আর যদি সে ব্যক্তি না-ও থাকেন, তবে কি তাঁর উত্তরসূরীরা সেই মুনাফা প্রাপ্য নয়? এ যেন এক আজব তামাশা! পশ্চিমারা ঠিক করে দিয়েছে ১৯২৩ সালের আগে রচিত সব লেখা ও আবিষ্কার "পাবলিক প্রপার্টি"।[২৭] আর এরপর তারাই ঘোষণা দিয়েছে "বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি" (Intellectual Property) এমন এক মালিকানাধিকার, যার স্বত্বাধিকার মৃত্যুর পর ৫০ বা ৭০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে, এরপর তা বিলুপ্ত হয়ে যায়![২৮] কী বিস্ময়কর ব্যাপার!

প্রিয় পাঠাক! চলুন যুক্তিসঙ্গত চিন্তা (Rational Thinking) করা যাক। যদি জ্ঞান, জ্ঞানভিত্তিক আবিষ্কার এবং চিন্তাশীল রচনার উপর কপিরাইট বৈধ হয়, তবে আসুন এর মূল শিকড় থেকে আলোচনা টানি। তাহলে কেন ১৯২৩ সালের পূর্ববর্তী যাবতীয় জ্ঞানকে 'পাবলিক প্রপার্টি' হিসেবে গণ্য করা হবে? কেন সেগুলোকেও ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে না? আমরা তো শরীয়ত প্রণেতা নই, বরং আমরা কেবল শরীয়ত অনুসন্ধানকারী। শরীয়তের বিধানসমূহ তো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই বিদ্যমান, আমরা আজ তা খুঁজে বের করেছি মাত্র। কারণ, ইজতিহাদ মানে

---

[২৭] Stephen M. McJohn, Copyright: Examples and Explanations (New York: Aspen Publishers, 2006), P. 163

[২৮] Lior Zemer, The Idea of Authorship in Copyright, (USA: Ashgate Publishing Limited, 2007), P. 157

শরীয়তের বিধান সৃষ্টি নয়, বরং পূর্বপ্রবর্তিত বিধানের অনুসন্ধান।[২৯] সুতরাং, যদি কুরআনের প্রতিটি কপির প্রকাশনায় প্রণেতা হিসেবে আল্লাহ তাআলার অধিকার স্বীকৃত হয়, তবে তার মুনাফা তো কা'বার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা উচিত। অনুরূপভাবে, হাদীসের প্রতিটি সংকলনের মুনাফা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরি আলিমদের জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। যদি প্রকাশকরা তা না করেন, তবে তারা শরীয়তের অনুসরণ করছেন না বরং নতুন শরিয়ত সৃষ্টি করছেন। অথচ ইজতিহাদ হলো শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদ্ঘাটনের নাম, তা রচনার নাম নয়।

ইনসাফের মানদণ্ড : শরীয়ত না কপিরাইট?

'কপিরাইট'-এর 'রাইট' অর্থই হচ্ছে 'অধিকার'। এখন প্রশ্ন হলো, কোনটা মানুষের অধিকার আর কোনটা না—সেটা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে? কোনো মানবসৃষ্ট আইন নয়, বরং কুরআন ও সুন্নাহ, তথা ওহিই এ বিষয়ে চূড়ান্ত মাপকাঠি। ওহির স্পষ্ট দলিল ছাড়া কোনো কিছুকে শরীয়তসম্মত অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহনযোগ্য নয়। এ বিষয়ে সমস্ত মুসলিমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। যদি প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনেই অধিকার নির্ধারিত হতো, তবে ট্যাক্স ব্যবস্থার সমস্ত আইনকেই শরীয়তসম্মত মানতে হতো; অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর আরোপকারী শাসকের জন্য বদদুয়া করেছেন।[৩০] বাংলাদেশী আইনে ইয়াতিম নাতির জন্য দাদার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নির্ধারিত থাকলেও আলিমগণ এটিকে

---

[২৯] ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, আল-ওয়াজিযু ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, দারুল খাইর, দামেস্ক, ২০০৬ ঈ., ২/২৭৫

[৩০] অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না—সুনান আবূ দাউদ, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশআস, দারুর রিসালাতিল আলামিয়্যাহ, বৈরুত, ৪/৫৬২, ২০০৯ ঈ.

শরীয়তসম্মত অধিকার বলে মানেন না, কারণ ওহিতে এর স্বীকৃতি নেই।[৩১] [৩২] সুতরাং, প্রশ্ন হলো যদি কপিরাইটকে শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি 'অধিকার' হিসেবে ঘোষণা করা হয়, তবে এর শরীয়তসম্মত হওয়ার দলিল কী?

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, কপিরাইট দুই প্রকার—একটি 'সাহিত্যিক অধিকার', অপরটি 'আর্থিক অধিকার'। সাহিত্যিক অধিকার সর্বজনস্বীকৃত; এ বিষয়ে কারও মধ্যে সামান্যতম মতদ্বৈধ্যও নেই।[৩৩] যেকোনো রচনা, গ্রন্থ, উদ্ভাবন কিংবা আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবিকল্পভাবে মূল প্রণেতা ও স্রষ্টার সঙ্গেই সম্বদ্ধ থাকবে; ভিন্ন কেউ সেটিকে নিজের বলে দাবি করলে তা নিছক মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনা, যা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। যেমন ইলম কেবল আলিমের সাথেই সম্পৃক্ত, জাহিলের সাথে নয়; কর্মের কৃতিত্ব কর্মীতেই সীমাবদ্ধ থাকে, অকর্মাতে নয়। এটাই প্রকৃতিগত ও সর্বজনীন বিধান। অন্যদিকে, আর্থিক অধিকারের প্রশ্নে মতভিন্নতা রয়েছে। তা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় কি না, সে বিষয়ে আলিম সমাজের তিনটি মতামত পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আমরা বলেছি, জ্ঞান ধন-সম্পদ নয়; অতএব তার বিধানও সম্পদের বিধানের ন্যায় হতে পারে না। কারণ, সম্পদ এক বস্তুগত (tangible) উপাদান; যা ধরা যায়, অনুভব করা যায়, গোনা যায় ও বিক্রি করা যায়। আর জ্ঞান হলো নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষতার নাম; ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার প্রজ্ঞা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: ﴿فَلَيَعۡلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ صَدَقُوۡا وَ لَيَعۡلَمَنَّ الۡكٰذِبِيۡنَ﴾ *অর্থাৎ, "আল্লাহ অবশ্যই জানিয়ে দেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।"*[৩৪]

---

[৩১] Ministry of Law, The Muslim Family Laws Ordinance, 1961, Section 4 — https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-305/section-13528.html

[৩২] https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/detail/511/

[৩৩] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখতিরা ওয়াত-তালীফ ফিল ফিকহিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ১১৬

[৩৪] সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত ২৯:৩

আসলে জ্ঞান একটি গুণ। একটি বৈশিষ্ট্য। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী আলিমরা নবীগণের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন।[৩৫] এই উত্তরাধিকার কোনো টাকাপয়সা নয় যে আমরা তাতে দুনিয়াবি সম্পদের বিধান জুড়ে দেব।

আমরা রূপক অর্থে চৌর্যবৃত্তিকেও 'চুরি'-ই (plagiarism) বলে থাকি। অতএব, বাক্যালঙ্কারের দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে বলায় কোনো আপত্তি নেই। তবে যারা জ্ঞানকে সম্পদ বলে মনে করেন, তাদের কি উচিত না সাহিত্য-চুরির অপরাধে হাত কেটে দেওয়ার শরঈ হদ জারির ফাতাওয়া প্রদান করা? কেননা, কেউ যদি কোনো একটি মতকে পূর্ণ অন্তরঙ্গতা ও প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করে, তাহলে সেটার সকল ফিকহি পরিণতিকে স্বীকার করাও তার জন্য ওয়াজিব; তবেই তা একটি সুসংহত ও গঠনমূলক মত হিসেবে গণ্য হবে। আর কৌতূহলোদ্দীপক সত্য হলো কপিরাইট সমর্থক আলিমরাও জ্ঞানকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করেন না।

সুতরাং সারকথা এই যে, একজন লেখকের সাহিত্যিক অধিকার নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত, এতে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু আর্থিক অধিকারের প্রসঙ্গে কথা এলে বিষয়টি বিশ্লেষণসাপেক্ষ। বিষয়টি এভাবে প্রমাণিত নয়, যেভাবে প্রচলিত কপিরাইটকে প্রথাগত ও আইনি ধারণার আলোকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। তাহলে প্রশ্ন হলো, লেখকের এই আর্থিক অধিকারের (copyright অর্থাৎ তার সম্পদ-সংক্রান্ত অধিকার) শরঈ ভিত্তি কী? এর উত্তরে সাধারণত একটি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করা হয়:

---

[৩৫] নিশ্চয়ই আলিমরা নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নিশ্চয়ই নবীগণ দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে যাননি; বরং তারা জ্ঞান রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে বড়ই প্রাচুর্যময় অংশ লাভ করল—আত-তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, সুনানুত-তিরমিযী, ওয়ামাতবাআতু মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী – মিসর, ১৯৭৫ ঈ., ৫/৪৮

«أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» *অর্থাৎ, "পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে অধিক হকদার হলো আল্লাহর কিতাব।"* [৩৬]

কেউ যদি ঝাড়ফুঁক করে, কুরআন শিক্ষা দিয়ে কিংবা কোনো বই লিখে বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে উপার্জন করে তাতে নিষেধের কিছু নেই। সমস্যার জায়গাটা এখানে নয়। কেউ যদি কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে ঝাড়ফুঁকের একটি পদ্ধতি তৈরি করে, তবে সেটি একটি সেবা (service)। তিনি এই সেবার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেন। এটি হাদীস থেকেই প্রমাণিত।[৩৭] কিন্তু তিনি যদি দাবি করেন, এই নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীসের সমন্বয়ে যে ঝাড়ফুঁক আমি আবিষ্কার করেছি, তা কেবলই আমার, এবং এর উপর আমার কপিরাইট থাকবে, কেউ আর এটি ব্যবহার করতে পারবে না; তাহলে প্রশ্ন উঠবে এই একচেটিয়া অধিকার (monopoly) তিনি কোথা থেকে পেলেন? অথচ কুরআন তো তার রচনা নয়, হাদীসও তার গ্রন্থ নয়। আবার যদি কোনো ডাক্তার চিকিৎসার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ভিন্ন ওষুধের সমন্বয়ে একটি প্রেসক্রিপশন লেখেন এবং সেটার ওপর কপিরাইট দাবি করেন, তাহলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক কি তা মেনে নেবে? একই কথা লেখা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায় প্রতিটি বই বা উদ্ভাবনই পূর্ববর্তী জ্ঞান ও ভাবনার ভিত্তিতে নির্মিত হয়। অতএব, প্রকৃত অর্থে কোনো গ্রন্থ কিংবা উদ্ভাবন সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি হিসেবে গণ্য হয় না, বরং তা পূর্বসূরিদের জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিকাশ মাত্র।

[৩৬] সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাবু মা ইউতা ফির রুকইয়াতি আলা আহইয়াইল আরাবি বিফাতিহাতিল কিতাব, ৩/৯২

[৩৭] সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাবু মা ইউতা ফির রুকইয়াতি আলা আহইয়াইল আরাবি বিফাতিহাতিল কিতাব, ৩/৯২

চলেন ইকটু মাথা খাটাই

একটি বই—হয়তো অনুবাদ, নয়তো মৌলিক রচনা। যদি অনুবাদ হয়, তবে প্রশ্ন হচ্ছে প্রকাশনীগুলো কি মূল লেখককে কিংবা তার উত্তরসূরি বা অধিকারীকে রয়্যালটি প্রদান করছে? উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি কুরআন মাজিদের অনুবাদ করেন, অথবা কোনো সংকলিত হাদীসগ্রন্থ কিংবা আইম্মায়ে কেরাম বা সালাফে সালেহীনের কোনো কিতাব অনুবাদ করেন, তবে সেটির মূল তো তার সৃষ্টি নয়। আর সেগুলো যাঁদের রচনা, তাঁদের কোনো কপিরাইট নেই; কারণ পশ্চিমারা বলেছে ১৯২৩ সালের আগের কোনো রচনা বা আবিষ্কারের ওপর কপিরাইট প্রযোজ্য হবে না। অথচ যদি কপিরাইট সত্যিই একটি শরঈ অধিকার হয়, তবে ত্বাগূতের এ জাতীয় ঐকমত্য দ্বারা কোনো মুসলিমের শরঈ অধিকার বাতিল হয়ে যেতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন জাগে সালাফে সালেহীনের গ্রন্থগুলোর কপিরাইট কি তাঁদের উত্তরসূরিদের হাতে থাকা উচিত নয়? আর যাঁদের কোনো উত্তরাধিকারী নেই, তাঁদের সম্পদ কি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বাইতুল মালে জমা হওয়া উচিত নয়? যে দলিল দ্বারা আজকের যুগে কপিরাইট প্রমাণ করা হচ্ছে, সেই একই দলিলের মাধ্যমেই তো গত চৌদ্দ শতক ধরে তা প্রমাণিত হয়ে আসছে। সুতরাং প্রকাশনা সংস্থাগুলো কোন অধিকারে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু হানিফা কিংবা ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুমুল্লাহদের গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে ব্যবসা পরিচালনা করছে? তারা কি তাঁদের কাছ থেকে কপিরাইট নিয়েছে?

এবার আসি মৌলিক রচনার প্রসঙ্গে। ধরা যাক বইটি মৌলিক রচনা। তাহলে সেটি আসলে কতটুকু লেখকের সৃজন? আজকাল একটি ভালো মানের গবেষণাপত্রেও অন্তত একশো একটি উৎস দেওয়া লাগে। তাহলে একটি ধর্মীয় কিতাব, যেখানে মূলত কুরআনের আয়াত, হাদীস, এবং বিখ্যাত মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণের মতামত স্থান পায়, সেখানে লেখকের নিজস্ব অবদান আসলে

কোথায়? কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করা, তার অনুবাদ উপস্থাপন করা, ব্যাখ্যা হিসেবে ইমাম তাবারী, ইমাম কুরতুবী বা ইমাম ইবনু কাসীরের মতামত তুলে ধরা—এসব তো তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়। হাদীস বর্ণনা ও তার অনুবাদও তো স্বতঃসিদ্ধভাবে লেখকের রচনা নয়। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত ইমাম ইবনু হাজার, ইমাম নববী বা অন্য ইমামদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। তাহলে লেখক যে গ্রন্থকে নিজের "সৃষ্টি" বলে দাবি করছেন, সেটিতে তার ব্যক্তিগত অবদান আসলে কতটুকু? খুব হিসাব করলে দেখা যাবে লেখকের মৌলিক অবদান বলতে যা থাকে তা হলো কিছু প্রথাগত বাক্য, যেমন কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করার আগে "আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন", হাদীস বর্ণনার আগে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন", অথবা সাহাবী, তাবেয়ীন কিংবা সালাফে সালেহীনের উক্তির আগে "অমুক ইমাম বলেছেন" —এ জাতীয় বাক্যাংশ। এইরকম গুটিকয় বাক্যই কি তার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও সামগ্রিক সৃষ্টি, যার রয়্যালটির তিনি দাবিদার? এবং তিনি মনে করেন এগুলোর ওপর অধিকার শুধু তারই থাকা উচিত, অন্য কারো নয়? সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়!

এই বিষয়টি কেবল ইসলামি লেখকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; দর্শনের গ্রন্থাবলীতেও দেখা মিলবে একই চিত্রের। একটি বই হাতে নিলে দেখা যাবে কোনো বিষয়ে অ্যারিস্টটল কী বলেছেন, তা উদ্ধৃত হচ্ছে; অন্যত্র বার্ট্রান্ড রাসেলের মতামত তুলে ধরা হচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অবস্থা অভিন্ন। প্রতিটি তত্ত্বের পেছনে কোনো না কোনো ব্যক্তির নাম জড়িত। এক জায়গায় লেখা "নিউটনের গতিসূত্র অনুযায়ী...", আরেক স্থানে "আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে..."; তাহলে প্রশ্ন আসে লেখক যে লেখাকে তার নিজস্ব কৃতিত্ব বলে গণ্য করছেন, সেখানে আদতে ঠিক কতটুকু তার?

এবার বর্তমান লেখক-গবেষকদের কথা ধরা যাক। তারা কি বাস্তবেই লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে গবেষণা বা লেখালিখি করেন? অধিকাংশ তো

ইন্টারনেট থেকে পিডিএফ সংস্করণ, গুগল বুকস কিংবা মাকতাবায়ে শামেলার মতো সফটওয়্যার ব্যবহার করেই গবেষণালব্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। এ অবস্থায় যে ই-বুক থেকে তারা নিজেরা উপকৃত হয়েছেন, সেই একই পিডিএফ অন্য কেউ শেয়ার করলে তাকে দোষারোপ করা—এই বৈপরীত্যই বা কোন যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য? যে লেখক তার বইতে আরও শখানেক বইয়ের সূত্র বা রেফারেন্স যুক্ত করেছেন, সেসব বই কি তিনি কিনে পড়েছেন? হয়তো বলা হবে লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যখন বই অনলাইনে সহজলভ্য, তখন খুব কম মানুষই লাইব্রেরির ধুলোমাখা বই নাড়াচাড়া করে। আর লেখক যে অনলাইনে পড়া বইয়ের তথ্য ব্যবহার করেছেন, সেসব বই প্রকাশক বা লেখকের অনুমতি নিয়ে আপলোড করা হয়েছিল কি না, তা কি তিনি নিশ্চিত হয়েই গ্রহণ করেছিলেন? যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বই টাইপ করা হয়েছে তার লাইসেন্স কি বৈধভাবে কোম্পানি থেকে ক্রয় করা হয়েছিল, নাকি ক্র্যাকড ভার্সন এনে ব্যবহার করা হয়েছিল? যে উইন্ডোজে পুরো বই প্রস্তুত করা হলো, সেটাই বা আসল নাকি পাইরেটেড কপি? যেসব বই অনুবাদ করে অনুবাদক-প্রকাশকরা ব্যবসা করে খাচ্ছেন, দেখা যায় সেই বইগুলোরও প্রথম পাতাতে লেখা থাকে 'লেখক/প্রকাশক কর্তৃক কপিরাইট সংরক্ষিত'। এখন প্রশ্ন হলো, কয়টা প্রকাশনী আসলে মূল লেখক বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি নিয়ে সেই অনুবাদ প্রকাশ করছে?

অনেকেই পিডিএফ শেয়ার করা নাজায়েয প্রমাণ করতে দলিল দেন এই হাদীস দিয়ে: «لا ضرر و لا ضرار» *অর্থাৎ, "কারো ক্ষতি কোরো না; না নিজ থেকে আর না প্রতিশোধ হিসেবে।"* [৩৮]

---

[৩৮] মালিক ইবনু আনাস, আল-মুয়াত্তাআ, মুআসসাসাতু যায়িদ ইবনু সুলতান, আল-ইমারাত, ২০০৪ ঈ., ৪/১০৭৮

ক্ষতির ব্যাপারে মূলনীতি হলো, কিছু ক্ষতি এমন আছে যেগুলোকে শরীয়ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে। তবে এমনও অনেক বিষয় আছে যেগুলো বাহ্যিকভাবে ক্ষতি মনে হলেও, শরীয়ত আসলে সেগুলোকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। আমরা سدّ الذرائع (ক্ষতির সম্ভাবনার কারণে কোনো কাজ নিষিদ্ধ করা) প্রসঙ্গেও দেখি যে, সব ধরনের আশঙ্কা শরীয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য হয় না। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক কেউ বলল, "আমি যদি রাস্তায় গাড়ি বের করি, তবে সম্ভাবনা আছে হয়তো কোনো পথচারী আমার গাড়ির নিচে চলে আসবে।" এখন এই আশঙ্কার কারণে কি তার উচিত হবে একেবারেই গাড়ি না বের করা? অবশ্যই না। কারণ, এ ধরনের ক্ষতি কেবলই সম্ভাবনা বা কল্পনার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে, আর শরীয়ত এমন অনিশ্চিত ক্ষতির প্রতি গুরুত্ব দেয় না। যদি কোনো এলাকায় বড় কোনো সুপারশপ খুলে যায়, আর এর প্রভাবে আশেপাশের ছোট দোকানদারদের ব্যবসা ভেঙে পড়ে—তাহলে কি সুপারশপ খোলা হারাম হয়ে যাবে? হাদীসের এমন অপব্যাখ্যা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো কাজ যদি কারও জন্য মুবাহ হয়, তবে তা আরেকজনের লাভ বা ক্ষতির ভিত্তিতে হারাম হয়ে যেতে পারে না। আগে এর শরঈ হালাল-হারামের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে, পরে ক্ষতি-সুবিধার প্রশ্ন আসবে। আবার কেউ কেউ বলেন, "عرف" (Custom) একটি দলিল। কিন্তু আমরা তো জানি, রেওয়াজও দুই রকম—একটি সহীহ, অন্যটি ফাসিদ। আর ফাসিদ রেওয়াজ শরঈ দলিল নয়।[৩৯] যদি কপিরাইট একটি عرف হয়, তবে মীলাদ-কিয়াম কিংবা শবে বরাতে হালুয়া-রুটি খাওয়াও তো সমাজের প্রচলিত রেওয়াজ! অথচ সেগুলোকে বিদআত বলা হচ্ছে, কারণ সেগুলো পরবর্তীকালের উদ্ভাবন। তাহলে কপিরাইটকেও কেন সেভাবে দেখা হচ্ছে না, যখন এটিও একবিংশ শতকের একটি ধারণা?

---

[৩৯] আবদুল-ওয়াহ্হাব খাল্লাফ, ইলমু উসূলিল ফিকহ, মাকতাবাতুদ-দাওয়াহ, আল-কাহিরাহ, পৃ. ৮৯

ইতিহাস যদি কপিরাইটের ছায়ায় গঠিত হতো

এ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক—"কপিরাইট কি তাহলে বিদআত?" উত্তর হলো, যখন একে 'শরঈ হক' দাবি করা হচ্ছে অথচ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোনো যুগে এই 'হক'-এর অস্তিত্বই ছিল না, তখন এটি নিঃসন্দেহে একটি নব উদ্ভাবিত শরঈ বিধান, যা শরীয়তের নামে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি এটি সত্যিকারের শরঈ হক হতো, তাহলে তা অতীত চৌদ্দ শতাব্দীজুড়ে চলমান থাকতো। তখন কেউই ইমাম বুখারীর কিতাব অনুবাদ করতে পারত না, ছাপাতে পারত না, এমনকি তাঁর লেখার উদ্ধৃতিও দিতে পারত না—যতক্ষণ না অনুমতি মিলতো। বাস্তবতা হচ্ছে, হাজার বছর ধরে দুনিয়াজুড়ে লক্ষ লক্ষ দীনি ও দুনিয়াবি গ্রন্থ কপিরাইট ছাড়াই মুক্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জ্ঞান প্রবাহিত হয়েছে নিঃস্বার্থভাবে। আমরা আজ যা জানি, যা লিখি, তা তাঁদেরই অবদান। সেই জ্ঞানের বুনিয়াদে দাঁড়িয়ে কেউ যদি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ওই জ্ঞান অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তার নিজেরই বিবেচনা করতে হবে এর নৈতিকতা কতটুকু। যদি কপিরাইট সংক্রান্ত আইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই থাকতো, আজ আমাদের কাছে ঠিক কতটা ইলম পৌঁছাতো?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ আমাদের কাছে পৌঁছেছে হাদীসবিদগণের মাধ্যমে। তাঁরাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেগুলো সংরক্ষণের দ্বারা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁরাই এক অর্থে তা সহজলভ্য করেছেন। যদি সেই যুগেও কপিরাইট আইন থাকত, তবে এর প্রকৃত হকদার হতেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইবনু মাজাহ রহিমাহুমুল্লাহ—যাঁরা বছরের পর বছর নিরলস শ্রম দিয়ে হাদীসসমূহ সংগ্রহ, যাচাই ও সংকলন করেছেন। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তো সাড়ে ষোল বছর ব্যয় করে সহীহ বুখারী সংকলন করে উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন এক

অনন্য সম্পদ। কিন্তু তিনি কখনো বলেননি– ‘এটি আমার কপিরাইট। ’ সাধারণত কেউ যদি বুখারী থেকে একটি হাদীস তুলে নিয়ে অনুবাদ করতে চান, শুধু অনুবাদ করতে গেলেও তার ‘ফাতহুল বারী’ -এর দরকার হবে। কারণ, হাদীসের অনেক একক শব্দ, দুর্বোধ্য শব্দ, প্রেক্ষাপট—এসব বিষয় বোঝা কঠিন। অনেক সময়, বরং অধিকাংশ সময়ই সরাসরি বোঝা যায় না। এজন্যই যুগশ্রেষ্ঠ শায়খুল হাদীসরাও ফাতহুল বারী ছাড়া সহীহ বুখারীর দারস দেন না। উল্টো তাঁরা এটিকে গর্বের বিষয় হিসেবে গণ্য করেন যে, তাঁরা হাফিয ইবনু হাজারের এই ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করছেন।

অতএব, যুগে যুগে মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ তাঁদের পরিশ্রমসাধ্য ও জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞের পরও কখনো কপিরাইট দাবি করেননি। বরং উম্মাহর সামনে দীনের জ্ঞানকে উন্মুক্ত ও অবাধ করে দিয়েছেন, যাতে তা যুগে যুগে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলো ছড়াতে পারে।

পুঁজিরাইট

বাস্তবতা হলো, কপিরাইটের ধারণা মূলত পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার গর্ভজাত। একে দীন নয়, ব্যবসা রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় একজন আলিম হয়ে যান বিক্রেতা, তালিবে ইলম হয়ে যায় ক্রেতা, আর ইলম হয়ে ওঠে বাজারজাত পণ্য—যার রায়্যালটির অঙ্ক নিয়ে দরকষাকষি চলে, আর পাণ্ডুলিপি এক প্রকাশকের দ্বার থেকে অন্য প্রকাশকের দ্বারে ঘুরপাক খায়। কিন্তু আমাদের পূর্বসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে প্রচলিত প্রসিদ্ধ একটি উক্তি:

رضينا قسمة الجـــبار فينا... لنا علم وللجـــــــهال مال

فإن المال يفنى عن قريب...وإن العلـــم باق لا يزال

"আমরা আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালায় খুশি,

আমাদের ভাগে জ্ঞান, মূর্খদের জন্য ধনরাশি।

ধন তো দ্রুতই ফুরায়, হবে তার ক্ষয়,

জ্ঞান চিরস্থায়ী, কখনও হবে না তার লয়।"[৪০]

কপিরাইট কি আদৌ কেবল একটি আর্থিক অধিকার? এর প্রকৃত বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়—এটি আর্থিক অধিকারের চেয়ে বরং এমন এক ধরনের মালিকানাধিকার, যার উদ্দেশ্য সম্পদ উপার্জনের চেয়ে অধিকতরভাবে জ্ঞানের প্রচার রুদ্ধ করে দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে পেটেন্ট আইনের দিকে তাকানো যেতে পারে। পেটেন্ট আইন অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি কিছু আবিষ্কার করে, তবে সেই আবিষ্কারের ব্যবহার, উৎপাদন, বিক্রয়, এমনকি এর উন্নয়ন সাধনের জন্য পরিবর্তনও নিষিদ্ধ, কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য।[৪১] সুতরাং 'লেখক ও উদ্ভাবকের আর্থিক স্বত্ব সংরক্ষণ' নামক আইনের আড়ালে মূলত জ্ঞানের প্রচারকে কঠোরভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। এ কারণেই এমন অনেক বরেণ্য আলিম যারা কপিরাইট সমর্থন করেন তাঁরাও স্বীকার করেছেন, যদি উদ্দেশ্য হয় ব্যবসা ব্যতীত নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া, তবে লেখকের অনুমতি ছাড়াও বইয়ের ফটোকপি বা পিডিএফ শেয়ার করা বৈধ। যেমন, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ আল-উসাইমীন ও শায়খ বিন বায—দু'জনেই এমন মতামত দিয়েছেন।[৪২]

---

[৪০] https://www.aldiwan.net/poem30929.html

[৪১] Joo-Young Lee, A Human Rights Framework for Intellectual Property, Innovation and Access to Medicine, (USA: Ashgate, 2015), p. 183

[৪২] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখতিরা ওয়াত-তালীফ ফিল ফিকহিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ৩২৫

পেটেন্টস (patents) সংক্রান্ত আইন অনুসারে যদি কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির গবেষক কোনো রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেন, তবে সেই কোম্পানির কাছেই শুধু ওষুধটির মালিকানা স্বত্ব থাকবে। ফলে কোম্পানিটি সেই ওষুধের একচেটিয়া উৎপাদন ও বিপণনের অধিকার লাভ করবে, এবং নিজের ইচ্ছেমতো দাম নির্ধারণ করতে পারবে। ফলে সেই ওষুধ সাধারণ গরিব মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যাবে; লাখ লাখ মানুষ চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করবে, কিন্তু 'কপিরাইট আইন' জিন্দাবাদ! ওষুধ যদি তারা বানিয়ে থাকে, তাহলে রোগও তো তাদেরই সৃষ্টি, তাই না? সুতরাং তারা তো কোনো অনুগ্রহ করেনি। উন্নয়নের নামে তারা শিল্পকারখানা গড়েছে, পরিবেশে বিষাক্ত রাসায়নিক ছাড়িয়ে দিয়েছে, বাতাস, পানি, খাদ্য—সবকিছু দূষিত করেছে। এসব কারণেই তো নিত্যনতুন রোগ জন্ম নিচ্ছে। এখন আবার তারাই রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার করে সেটির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে! এটা কোনো কৃতিত্ব নয়, এটা অবিচার। এখানেই শেষ নয়। এমনকি কোনো গবেষক যদি সেই ওষুধের ওপর আরও বিস্তর গবেষণা করতে চান, তাহলেও তাকে অনুমতি নিতে হবে। মানে তারা শুধু ওষুধ বিক্রিতে নয়, সেই ওষুধের ফর্মুলা নিয়েও একচেটিয়া অধিকার দাবি করছে। কেউ সেটি উন্নত করার উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করতে পারবে না![৪৩]

কৃষিক্ষেত্রে TRIPS[৪৪] এগ্রিমেন্টকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। ট্রিপস চুক্তির একটি ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে তাদের দেশে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস কার্যকরভাবে সুরক্ষিত থাকার

---

[৪৩] H. Jackson Knight Patent Strategy: For Researchers and Research Managers, USA: Wiley, 2013, p.

[৪৪] Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights—এটি নির্ধারণ করে যে পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, শিল্প নকশা (industrial designs), এবং ভৌগোলিক নির্দেশক (geographical indications)-এর মতো Intellectual Property Rights বা IPR বিশ্বব্যাপী কীভাবে সুরক্ষিত হবে।

বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। হোক তা বীজ-সংক্রান্ত, কীটনাশক সম্পর্কিত, কিংবা বায়োটেকনোলজি-ভিত্তিক কোনো উদ্ভাবন—সব ক্ষেত্রেই এ সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা বহাল থাকতে হবে।[৪৫] এর সরল অর্থ দাঁড়ায়, একবার কোনো দেশ ট্রিপসে স্বাক্ষর করলে সে দেশের কৃষকরা আজীবন জেনেটিক্যালি মডিফাইড (GM) বীজ ব্যবহারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বীজ বপনের সময় কৃষককে সেই একই কোম্পানির নির্ধারিত উচ্চমূল্যের কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। উৎপাদিত ফসল কখনো কখনো প্রাকৃতিকভাবেই বীজবিহীন (Sterile) থাকে। আর যদি বীজ পাওয়াও যায়, তবে চুক্তি অনুযায়ী কৃষক তা পুনরায় রোপণ করতে পারেন না। তাদের বাধ্য হয়ে প্রতি বছর নতুন বীজ কিনতে হয়। কোনো কৃষক যদি নিজ উদ্যোগে বীজ সংরক্ষণ করে পুনরায় বপনের দুঃসাহস দেখান, তবে কর্পোরেট মেধা-স্বত্বের রক্ষকরা তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এমনকি চরম শাস্তিও ভোগ করতে হয় তাদের।[৪৬]

এই ইন্টেলেকচুয়াল রাইটসের ছত্রছায়ায় পশ্চিমা করপোরেশনগুলি গোটা বিশ্বের কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষকসমাজকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। বাস্তবে আজ এ চিত্রই বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমানে মাত্র চারটি কোম্পানি বিশ্বের বীজ বাজারের প্রায় ষাট শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এই চার প্রতিষ্ঠান বৈশ্বিক বীজ সাপ্লাই-চেইনের নেতৃত্ব দিচ্ছে।[৪৭] ফল কী দাঁড়িয়েছে? ভারতে GM বীজ-নির্ভর কৃষি-ব্যবস্থার বোঝা এবং ঋণের মরণফাঁদে জড়িয়ে প্রায় তিন লক্ষ কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন।[৪৮] পাকিস্তানে Bt-cotton ফসল উৎপাদনকারী প্রায় সত্তর শতাংশ কৃষক এই কর্পোরেট শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। নিজেদের ঐতিহ্যবাহী বীজ ব্যবহার করতে না পারার ফলস্বরূপ

---

[৪৫] https://en.m.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement

[৪৬] Ibid

[৪৭] https://www.foodtimes.eu/planet/seeds-the-4-masters-of-the-world/

[৪৮] https://www.soci.org/chemistry-and-industry/cni-data/2017/10/killing-fields

তাদের ঘাড়ে চেপে বসছে একের পর এক ঋণের পাহাড়।[৪৯] আর্জেন্টিনায় GM-ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থার বিষাক্ত রাসায়নিকের পরিণতিতে দেশটিতে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫০] ফিলিপাইনে দেখা দিয়েছে পরিবেশ ধ্বংসের বিভীষিকা।[৫১] মেক্সিকোতে মেধা-স্বত্বের আগ্রাসনে সৃষ্ট GM দূষণের কারণে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় ভুট্টার জাতসমূহ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।[৫২] কৃষকসমাজ আজ এক ভয়ংকর চক্রে আটকা পড়েছে। স্থানীয় বীজ-শিল্প কার্যত অচল হয়ে পড়েছে; সমগ্র বীজ-বাজার চলে গেছে বহুজাতিক করপোরেট শক্তির একচেটিয়া কব্জায়। বাংলাদেশের জন্যও অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিণতি।[৫৩]

---

৪৯ https://ecommons.aku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1296&context=pakistan_ied_pdck&

৫০ https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/16096-argentina-cancer-increased-fivefold-in-town-near-gm-soy-and-maize-fields-study

৫১ https://panap.net/2020/02/cancer-causing-glyphosate-detected-in-gm-corn-fields-in-the-philippines/

৫২ https://grain.org/fr/article/entries/396-sprouting-up-contamination-by-gm-maize-found-in-nine-states-in-mexico

৫৩ বাংলাদেশ TRIPS এগ্রিমেন্টের সাথে চুক্তিবদ্ধ, কারণ বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর সদস্য রাষ্ট্র, এবং TRIPS চুক্তি WTO-এর সকল সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক। স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country - LDC) হিসেবে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ TRIPS-এর বহু কঠোর বিধান মানার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় ও দীর্ঘ রূপান্তরকালীন সুযোগ ভোগ করে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ ইতোমধ্যে LDC তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের (Graduation) চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে, এবং এই উত্তরণ কার্যকর হওয়ার কথা ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর। এই উত্তরণের ফলেই TRIPS-এর কঠোর বিধানসমূহ বাংলাদেশের জন্য পর্যায়ক্রমে কার্যকর হতে চলেছে, যা দেশের ওষুধশিল্পসহ অন্যান্য মেধাস্বত্ব-নির্ভর খাতের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। LDC অবস্থায় বাংলাদেশ যে বিশেষ সুবিধা পেত—যেমন আন্তর্জাতিক কোম্পানির পেটেন্টকৃত ওষুধ বিনা রয়্যালটিতে স্থানীয়ভাবে জেনেরিক ওষুধ হিসেবে উৎপাদন ও রপ্তানির সুযোগ; তা ২০৩৩ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকলেও, ২০২৬ সালের উত্তরণের পর অন্যান্য সকল LDC-ছাড় সুবিধা দ্রুত বাতিল হয়ে যাবে। WTO-এর সাম্প্রতিক আলোচনায় ২০৩৩ সাল পর্যন্ত সীমিত পরিসরে কিছু সুবিধা বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকলেও, সামগ্রিকভাবে কঠোরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে TRIPS-এর পেটেন্ট-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা কার্যকর হলে দেশীয়

একই অবস্থা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রেও। আগের থেকে আরও উন্নত সংস্করণে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যেও কেউ কোনো সফটওয়্যারে পরিবর্তন আনতে পারবে না। কারণ, আইন অনুযায়ী সেই অধিকার শুধুমাত্র তারই

কোম্পানিগুলোকে নতুন উদ্ভাবিত ওষুধ উৎপাদন করতে আন্তর্জাতিক পেটেন্টধারীদেরকে রয়্যালটি দিতে হবে। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাওয়ার পর বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে পেটেন্টকৃত ওষুধের ক্ষেত্রে Product Patent স্বীকৃতি দিতে হবে, যার অর্থ—দেশীয় প্রতিষ্ঠান আর বিনা অনুমতিতে এসব জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করতে পারবে না। নতুন আবিষ্কৃত বা পেটেন্টকৃত ওষুধের জেনেরিক সংস্করণ তৈরি করা কঠিনতর হবে, যদি না উচ্চ পরিমাণ রয়্যালটি প্রদান করা হয়। এতে উৎপাদন ব্যয় এবং বাজারমূল্য, বিশেষত ক্যান্সার কিংবা ভাইরাসজনিত রোগের মতো জীবনরক্ষাকারী ওষুধের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে। পেটেন্টজনিত প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও প্রবল। বর্তমানে বাংলাদেশ জেনেরিক ওষুধ উৎপাদন করে ১৫০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করছে; কিন্তু কঠোর পেটেন্ট বাধ্যবাধকতা এলে এই বাজারে প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। কৃষি-রাসায়নিক ও বায়োটেকনোলজি খাতও TRIPS-এর আওতায় উদ্ভিদ ও বীজ-সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব সুরক্ষার বিধানের অধীন হবে। হাজার বছর ধরে কৃষকেরা এক মৌসুমের ফসল থেকে উন্নত বীজ সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহার, বিনিময় বা বিক্রি করে আসছেন, এবং এটাই ঐতিহ্যবাহী কৃষকের বীজব্যবস্থা। কিন্তু কোনো কোম্পানি যখন নতুন উদ্ভিদজাত উদ্ভাবন করে (জিএমও বা সাধারণ হাইব্রিড), তখন তারা UPOV-এর মতো চুক্তির মাধ্যমে এর ওপর মেধাস্বত্ব দাবি করে। এই সুরক্ষা কার্যকর হলে কৃষকের নিজস্ব উৎপাদিত ফসল থেকে বীজ সংরক্ষণ করে পুনঃব্যবহারের অধিকার (Farm-Saved Seed Right) সীমিত কিংবা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে পেটেন্টকৃত বীজ ব্যবহারকারী কৃষককে প্রতি বছর কোম্পানি থেকে নতুন বীজ কিনতে বাধ্য হতে হয়। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে তা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘন (IP infringement) হিসেবে গণ্য হয়ে মামলা বা জরিমানার মতো শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার আশংকা থাকে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ভৌগোলিক নির্দেশক (GI)সহ অন্যান্য মেধাস্বত্ব অধিকার কঠোরভাবে ও দ্রুত প্রয়োগ করতে হবে। LDC হিসেবে যে দীর্ঘ শিথিলতা বাংলাদেশ পেত, উত্তরণের পর তা আর থাকবে না। পাইরেসি দমন জোরদার হবে; লাইসেন্সবিহীন বা নকল সফটওয়্যার ব্যবহার বন্ধের কঠোরতা বাড়বে, ফলে ছোট ও মাঝারি আইটি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য লাইসেন্সিং ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ী মহল, বিশেষ করে ওষুধশিল্প উদ্যোক্তারা মনে করছেন, এই পরিবর্তন কার্যকর হলে দেশের রপ্তানি খাত ও সামগ্রিক অর্থনীতি বড় ধরনের চাপের মুখে পড়বে। এভাবেই বাংলাদেশের নব্বই শতাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী, তথা এই দেশের সাধারণ মানুষ আন্তর্জাতিক কপিরাইট ব্যবস্থার শোষণমূলক কাঠামোর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কার মুখোমুখি অবস্থান করছে। https://www.tbsnews.net/thoughts/benefits-trips-agreement-will-disappear-ldc-graduation-what-then-238348

থাকবে, যিনি প্রথমবার সফটওয়্যারটি তৈরি করেছেন। যদি তিনি পরিবর্তন করতে না চান, তাহলে সেটি আগের অবস্থাতেই পড়ে থাকবে। এর পেছনে মূল যে দর্শন, তা হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতি, যেখানে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ধন-সম্পদের বৃদ্ধি, জ্ঞান বা চিন্তার প্রচার-প্রসার নয়। কপিরাইট আইনের কারণে জ্ঞানের প্রচার বাধাগ্রস্ত হয় এবং আবিষ্কারের চাকা ধীর হয়ে যায়; এই কারণের ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে "কপি লেফট" (Copy Left) আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।[৫৪] যদিও তাদের অন্তরে দীনের বুঝ ছিল না, তবুও তারা উপলব্ধি করেছিল কপিরাইটের নামে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে, তার অন্তরালে নিহিত রয়েছে কেবল স্বার্থান্বেষণ ও অর্থলোভ। জ্ঞান—যা মানবজাতির সামষ্টিক সম্পদ, তার প্রবাহকে অবরুদ্ধ করতে নানা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হচ্ছে। জ্ঞানের পথে এভাবে দেয়াল তুলে দেওয়া ন্যায়সংগত নয়, এটা অন্যায়। অতিমাত্রায় কপিরাইট ও পেটেন্ট চাপিয়ে দেওয়া আসলে জ্ঞানকে শৃঙ্খলিত করার আরেক রূপ। এরই প্রেক্ষিতে ইউরোপের ভেতরে এই সজাগ বোধের উদ্ভব হয়।

"কপি লেফট" আন্দোলনের উদ্দেশ্য কখনোই এমন ছিল না যে, কেউ যদি কোনো সফটওয়্যার তৈরি করে, তাহলে এর বিনিময়ে কোনো অর্থ নিতে পারবে না। বরং, সে অবশ্যই তার শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। কিন্তু এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল—কেউ তার লেখা, আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের জন্য পারিশ্রমিক নেওয়ার পাশাপাশি এমন অধিকারের দাবি করতে পারবে না, যা জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করে। এই ভাবনাকে সামনে রেখেই "Free Software Foundation" একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করে, যার নাম GNU। এটি ছিল সম্পূর্ণ কপিরাইট মুক্ত। পরবর্তীকালে

---

[৫৪] John D. H. Downing (Editor), Encyclopedia of Social Movement Media, UK: Sage, 2011, p. 142

জনপ্রিয় “লিনাক্স” (LINUX)-এর কিছু অংশেও এই GNU ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, সফটওয়্যারে জ্ঞানভিত্তিক সহযোগিতার একটি নতুন দিগন্ত রচনা করা হয়।[৫৫]

কপিরাইটের বৈধতা কি আদৌ সম্ভব?

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন রহ. বলেন, যখন কোনো প্রকাশক তাঁর কোনো বই বা ক্যাসেটের খরচ আদায় করে ফেলেন, তখন তাঁর উচিত নয় তিনি অন্যদের সেই জিনিস ছড়িয়ে দিতে বাধা প্রদান করবেন। কেননা, জ্ঞানের প্রসারের পথে এ ধরনের রুদ্ধদ্বার নীতি গ্রহণ করা মোটেও সংগত নয়।[৫৬] এই ফাতাওয়ার ওপর আমাদের ইসলামি প্রকাশকরা আমল না করলেও চলচ্চিত্র নির্মাতারা ঠিকই করে থাকে। সাধারণত মুভি ডিরেক্টর কিংবা প্রোডাকশন হাউজ শুরুতে কপিরাইট খুব কড়াভাবে ধরে রাখে, কারণ ওই সময় তাদের বিনিয়োগের খরচ ওঠানো আর লাভ নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য থাকে। কিন্তু একসময় যখন সিনেমাটি জনপ্রিয় হয়ে যায় এবং অর্থনৈতিকভাবে সফল হয়, তখন তারা আর অতটা হস্তক্ষেপ করে না। বরং সেই সিনেমার অবাধ প্রচার, উদ্ধৃতি কিংবা রেফারেন্স তাদের জন্য বাড়তি বিজ্ঞাপন ও সুনামের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

আসলে জ্ঞান মানবজাতির একটি সম্মিলিত উত্তরাধিকার ছিল এবং আজও আছে। কিন্তু কেউ-কেউ একে ব্যক্তিগত উত্তরাধিকারে রূপ দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। উদাহরণস্বরূপ, উইকিপিডিয়ার প্রকাশনীতি ও ভাবধারা ঠিক তেমন

[৫৫] John D. H. Downing (Editor), Encyclopedia of Social Movement Media, UK: Sage, 2011, p. 142

[৫৬] হুসাইন ইবনু মৌলভী আশ-শাহরানি, হুকূকুল ইখ্‌তিরা ওয়াত্‌-তালীফ ফিল ফিক্‌হিল ইসলামী, দারুত-তাইবাহ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি., পৃ. ৩২৫

যা আমাদের দীন ইসলাম প্রত্যাশা করে; এতে সকলের সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে, এবং সকলের জন্য তা উন্মুক্ত ও সহজলভ্য। আমরা আগেও বলেছি জ্ঞান কারো ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার নয়, হতেও পারে না; এই তর্কই ভিত্তিহীন। প্রত্যেকেই তার ঘর্মসিক্ত শ্রম কিংবা আন্তরিক সেবার বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিতে পারেন, কিন্তু যে জ্ঞানভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তার উদ্ভাবন কিংবা রচনা নির্মিত, সেই জ্ঞানের একক মালিকানা দাবি করার কোনো ন্যায্যতা নেই। নতুবা এর অর্থ দাঁড়াবে—নিউটন প্রমুখ সহস্র বৈজ্ঞানিক, যাঁরা বিজ্ঞানের প্রাথমিক অট্টালিকা নির্মাতা, তাঁদের কোনো স্বত্ব নেই; অথচ আজকের তরুণ গবেষক, যারা সেই অট্টালিকার ছাদের শুধু প্লাস্টারটুকু মসৃণ করেছেন, তারা সর্বস্বত্বের অধিকারী! একই অবস্থা ইলমে দীনের ক্ষেত্রেও; চৌদ্দ শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা এই দিগন্তবিস্তৃত ইলমের প্রাসাদ নির্মাণে আজকের গবেষকদের অবদান কতটুকু যে তারা ছাদের সেই প্লাস্টারখণ্ডের ওপর স্বত্ব দাবি করছেন?

ধরা যাক, কেউ একটি বই কিনেছে এবং সেটির মূল্য পরিশোধ করেছে। সেই হিসেবে বইটি এখন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে চাইলে বইটি বিক্রি করতে পারে, ছিঁড়ে ফেলতে পারে, কাউকে উপহার দিতে পারে কিংবা কোনো পাঠাগারে রেখে দিতে পারে। এখন যদি সে বইটি কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে দিয়ে দেয়, তাহলে লেখকের আর্থিক ক্ষতি হবে কি না? অবশ্যই হবে। কারণ এখন হাজার হাজার মানুষ সেই বইটি পড়তে পারবে, ফলে তারা বইটি আর কিনবে না। তাহলে কি এখন কপিরাইটের অধীনে এমন একটা আইন পাস করা উচিত না, যেন বই লাইব্রেরিতে রাখাও নিষিদ্ধ হয়? কিন্তু অনেক লেখক-প্রকাশককেই দেখা যায় গর্ববোধ করে বলতে—আমার বই অমুক লাইব্রেরিতে আছে।

আচ্ছা, যখন কোনো প্রকাশক বই বিক্রি করেন, তখন আসলে তিনি কীসের দাম নেন? কাগজ, কালি আর মুদ্রণের মূল্য? নাকি বইতে অন্তর্ভুক্ত

জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর মূল্য? যদি তিনি প্রথমটির মূল্য নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে কন্টেন্টবিহীন সাদা পৃষ্ঠার বই বিক্রি করে দেখাতে হবে! আর যদি তিনি দ্বিতীয়টির দাম নিয়ে থাকেন, তাহলে কাগজ, কালি ও মুদ্রণ ছাড়াই কেবল জ্ঞানের কেনাবেচা করে দেখাতে হবে! মূলত তিনি দুটোরই মূল্য নিয়েছেন। তিনি পাঠককে কাগজ, মলাট ও কালি যেমন দিয়েছেন, তেমনি বইয়ের ভিতরের জ্ঞানটিও বিক্রি করে দিয়েছেন। এভাবেই লেখক প্রকাশককে, প্রকাশক পাঠককে জ্ঞান বিক্রি করে দিয়েছেন। এখন আর সেটা তাদের নয়, পাঠকের সম্পদ।

কপিরাইট বিষয়ক আলোচনার গভীরে প্রবেশ করে এখন একান্তভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়—এটি আসলে কী ধরনের অধিকার? এটি কি শরীয়তের স্বীকৃত ও অনুমোদিত কোনো হক, নাকি কেবল রাষ্ট্রীয় বিধিনীতির কোনো আইন (positive law) মাত্র? যদি বলা হয় কপিরাইট একটি শরীয়তসম্মত অধিকার, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় কপিরাইটের ভিত্তি ইসলামি শরীয়তের কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই ভিন্ন। প্রচলিত আইন নিজেই এই দাবির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ কপিরাইট আইন অনুযায়ী, কোনো গ্রন্থ বা সৃষ্টি-কর্মের উপর কপিরাইট কেবল লেখকের জীবনকাল ও মৃত্যুপরবর্তী ষাট বছর পর্যন্ত স্বীকৃত। এরপর সেটি জনসাধারণের সম্পত্তি (public domain) হিসেবে গণ্য হয়।[৫৭] অর্থাৎ, আইনের দৃষ্টিতে এটি এমন এক অধিকার যা মৃত্যুর পরও বহাল থাকে। কিন্তু শরীয়তের আলোকে চিত্রটি একেবারেই ভিন্নতর। ইসলামি শরীয়তের মূলনীতিতে অধিকারের ভিত্তি হলো—জীবন; মৃত্যু নয়। উসূলে ফিকহের তাত্ত্বিক আলোচনায় “أهليّة الوجوب” নামে একটি মৌলিক ও গভীর ধারণা রয়েছে; যার সারকথা হলো, কোনো ব্যক্তি

[৫৭] কপিরাইট আইন, ২০০০ - Laws of Bangladesh, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-846.html

জীবিত থাকলে তার উপর অধিকার আরোপ করা যায়, কিন্তু মৃত্যুর পর তার ওপর কোনো অধিকার আরোপের অবকাশ শরীয়ত রাখে না। ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তার অধিকার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়, নতুন করে আর কিছু সৃষ্টি হয় না।[৫৮] এটি শরীয়তের একটি অত্যন্ত সুসংহত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিকভাবে পরীক্ষিত দর্শন। এর বিপরীতে কপিরাইট আইন মৃত্যুর পরও এক কাল্পনিক অধিকারকে টিকিয়ে রাখে, যা শরীয়তের পরিভাষায় অদৃশ্য মালিকানার এক অযৌক্তিক ধারণা।

দ্বিতীয়ত, এই তথাকথিত অধিকার সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। একজন লেখক যদি একটি গ্রন্থ রচনা করার পরপরই ইন্তিকাল করেন, তবে তার কপিরাইট বলবৎ থাকবে ৬০ বছর। কিন্তু অপর এক লেখক যদি একই দিনে গ্রন্থ রচনা করে আরও ৫০ বছর জীবিত থাকেন, তবে তার কপিরাইট কার্যকর থাকবে ১১০ বছর! এ আবার কেমন অধিকার, যার মেয়াদ নির্ধারিত হয় লেখকের আয়ুষ্কালের ওপর ভিত্তি করে? অথচ শরীয়তের রূপরেখায় যেকোনো অধিকারকে নির্ধারিত, চূড়ান্ত ও সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই।

তৃতীয়ত, যদি কপিরাইটকে 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ' বা intellectual property বলা হয়, তাহলে তো এটিকে মালিকানাসম্পন্ন সম্পত্তি বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে। আর শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করলে তার সব মালিকানা অবিলম্বে উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনযোগ্য হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান আইন বলছে, লেখকের মৃত্যুর ৬০ বছর পর এই মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে এবং তা হয়ে যাবে 'জনসম্পত্তি'। তাহলে এটি কিভাবে শরীয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো?

---

[৫৮] ড. মুহাম্মাদ মুস্তফা আয-যুহাইলী, আল-ওয়াজিযু ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী, দারুল খাইর, দামেস্ক, ২০০৬ ঈ., ১/৪৯২

এখানেই শেষ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কপিরাইট আইন অনুযায়ী, ১৯২৩ সালের আগে রচিত বা উদ্ভাবিত কিছুর ওপর আর কোনো ব্যক্তির একক মালিকানা বা কপিরাইট স্বীকৃত নয়, সবই পরিণত হয়েছে ‘public domain’-এ।[৫৯] এখন প্রশ্ন জাগে, এই যুক্তি কোন শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ হলো? কপিরাইট যদি সত্যিই শরীয়তসম্মত কোনো হক হয়, তবে ১৯২৩ সালের আগে যাঁরা লিখেছেন বা আবিষ্কার করেছেন, তাঁরা কোন অপরাধে তাঁদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? জোহানেস গুটেনবার্গ—যিনি ১৪৪০ সালে পৃথিবীকে গত এক হাজার বছরের সেরা উদ্ভাবন হিসেবে স্বীকৃত ‘ছাপাখানা’র মতো বিপ্লবী আবিষ্কারের উপহার দিয়েছিলেন, তাঁকে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য কোনো কপিরাইট দেওয়া হয়নি? অথচ এই ছাপাখানায় ছাপা একটি বইয়ের জন্য আজকের একজন লেখক ষাট বছরের কপিরাইট দাবি করছেন! এটি কি অবিচার নয়? আমরা শুধু এইটুকু বলতে চাই, যদি কপিরাইটকে সত্যিকার অর্থে শরীয়তসম্মত অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে সমসাময়িক কপিরাইট আইনগুলোর পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধনের আহ্বান জানাতে হবে, যেন সেগুলো শরীয়তের মূলনীতি ও ইনসাফের ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অন্যদিকে, যদি বলা হয় কপিরাইট একটি রাষ্ট্রীয় আইন মাত্র, তবেও সেটিকে শরীয়তের মানদণ্ডে যাচাই করতে হবে। কেননা, সব রাষ্ট্রীয় আইন শরীয়তের অনুগামী হয় না। কোনোটি অনুকূল, আবার কোনোটি সরাসরি শরীয়তের পরিপন্থী। হ্যাঁ, কিছু নিরপেক্ষ আইন আছে যেগুলো সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র তৈরি করে এবং এগুলোর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পালন জরুরি হয়, যেমন ট্রাফিক আইন। কিন্তু যেখানে আইন শরীয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেমন ট্যাক্সের বিষয়টি, সেখানে শরীয়তের দৃষ্টিতে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা বৈধ হয়। আমাদের সমাজে ট্যাক্স-ব্যবস্থার অবস্থা এমন যে, প্রকারান্তরে চৌদ্দ

[৫৯] Stephen M. McJohn Copyright: Examples and Explanations, NY: Aspen Publishers, 2006, p.163

রকমের ট্যাক্স জনগণের ওপর চাপানো হয়েছে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে একই নিয়মে এই চাপ বহন করতে হয়। একজন গরিব মানুষ যদি তার মোটরসাইকেলে এক লিটার পেট্রোল ভরায়, সেই লিটারের পেছনে সরকার কেবল ট্যাক্স হিসেবেই ৩৫ থেকে ৪০ টাকা নিয়ে নেয়। ফলে তাকে ১১৮ টাকা দিয়ে সেই জ্বালানি কিনতে হয়। অন্যদিকে একজন ধনী ব্যক্তি যখন তার ল্যান্ডক্রুজারে জ্বালানি নেয়, তখন সেও প্রতি লিটার পেট্রোলে সমপরিমাণ ট্যাক্স অপরিহার্যভাবে দিয়ে থাকে। অর্থাৎ একজন গরিব মানুষ, যে বহু কষ্টে টাকা জমিয়ে বা কিস্তিতে একটি মোটরসাইকেল কিনেছে, তাকেও সেই একই হারে ট্যাক্স দিতে হয়, যেমনটা একজন ধনী দিয়ে থাকে। পুরো ব্যবস্থাটিই অযৌক্তিক এবং যুলুমনির্ভর। অনেক উলামায়ে কেরাম বলেন, যদি কোনো হিলা বা কৌশলের মাধ্যমে এই ধরনের রাষ্ট্রীয় বোঝা এড়িয়ে চলা যায়, তবে তা-ই করতে হবে। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে ট্যাক্স দিতে হবে।[৬০]

অনুরূপভাবে কপিরাইটও একটি অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং যুলুমনির্ভর আইন। এই ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। আর আমাদের দেশের আইন এমনিতেও পঙ্গু। সরলভাবে বললে, ইউরোপে যেভাবে আইন প্রয়োগ করা হয়, আমাদের দেশে তা হয় না; বিশেষত ইন্টেলেকচুয়াল রাইটসের আইনগুলো খুব একটা কার্যকর নয়। তাই যতটুকু সম্ভব রাষ্ট্রীয় ঝামেলা এড়িয়ে গিয়ে এর সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে হবে। জ্ঞানকে অবাধভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

কপিরাইটযুক্ত বিষয়বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় কিছু শর্ত সাপেক্ষে হয়ে থাকে। শর্ত মূলত দুই প্রকারের; এক প্রকার হলো বৈধ শর্ত যা আরোপযোগ্য, এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো অবৈধ শর্ত যা আরোপ করা সঠিক নয়। বৈধ শর্ত বলতে বোঝায় যা কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী, আর অবৈধ শর্ত সেগুলো যা কুরআন ও সুন্নাহর

---

[৬০] https://fatwaa.org/ফাতওয়া/লেনদেন/হালাল-হারাম/তাগুত-সরকারকে-ট্যাক্স/

পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী প্রণিধানযোগ্য:

« كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ » *অর্থাৎ, "যে কোনো শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা বাতিল, যদিও তা শত শর্ত হয়।"* [৬১]

অতএব, "আমরা বই বিক্রি করেছি, তবে এর কম্পোজিং বিক্রি করিনি"—এই দাবি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যদি কম্পোজিং বলতে বিন্যাস (layout) বা প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা (design) করার দক্ষতাকে (skill) বোঝানো হয়, তবে এসব তাদের মেধাভিত্তিক সম্পদ (intellectual property)। এমন দক্ষতা আদতেও বিক্রিযোগ্য নয়; বরং এসব অন্যদের শেখানো যেতে পারে। আর এই শেখানোর জন্য বিনিময় বা ফি গ্রহণ করা বৈধ। অন্যদিকে, যদি এর দ্বারা বইয়ের লিখিত উপাদান (composed material) বোঝানো হয়, তাহলে "আমরা বই বিক্রি করেছি, কম্পোজিং নয়"—এ কথা বলা হাস্যকর। বিষয়টা যেন এমন, একজন কাঠমিস্ত্রি বললেন, "আমি চেয়ার বিক্রি করেছি কিন্তু কাঠ বিক্রি করিনি" । তাহলে তিনি চেয়ারের নামে কী বিক্রি করেছেন? শুধু দশ-পনেরোটা পেরেক আর আঠা? প্রকাশক যদি কনটেন্ট বিক্রি না-ই করে থাকেন, শুধু সাদা কাগজ, বাঁধাই ও ছাপার মূল্য নিয়ে থাকেন, তাহলে দেখতে হবে তিনি ফাঁকা পৃষ্ঠার বই বিক্রি করে কতজনকে গ্রাহক বানাতে পারেন! একই মানের কাগজ, মলাট ও পৃষ্ঠা সংখ্যার বইগুলোর মূল্যের পার্থক্য মূলত ভেতরের বিষয়বস্তু বা উপাদানের কারণেই হয়ে থাকে। ক্রেতা যখন মূল্য পরিশোধ করেন, তখন তিনি দুটোর মূল্যই দেন; আর প্রকাশকের দাবি তিনি উপাদান বিক্রি করেননি। তাহলে কি তিনি সেই উপাদান গ্রাহককে ভাড়া (rent)

---

[৬১] সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল ইত্বক, বাবুল মুকাতাব, দারু ইহয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, ২/৮৪২

দিয়েছেন? সুতরাং, বিষয়টি ততটা সহজ নয় যতটা তারা এটিকে সহজ বানিয়ে রেখেছেন।

পিডিএফের ভ্রান্ত ভয় ও আধুনিক প্রকাশনা ভাবনা

কোনো বইয়ের পিডিএফ শেয়ার করে দিলে সেই বইয়ের বিক্রি কমে যাবে এবং প্রকাশক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন—এই যুক্তি খুব একটা ওজস্বী বলে মনে হয় না। কারণ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কারণে কাগুজে পত্রিকার বিক্রি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। বিশ্বের প্রায় সকল প্রখ্যাত সংবাদপত্রের ইলেকট্রনিক মিডিয়া সারাক্ষণই অনলাইনে থাকে, অথচ এসব পত্রিকার মালিকরা তা নিয়ে মোটেও বিচলিত নন। বরং এতে তাদেরই উপকার, তাদের অনলাইন পাঠকের সংখ্যা বাড়ে এবং ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেখিয়ে তারা বিপুল অর্থ আয় করেন। তবে যখন পত্রিকা বিক্রেতারা পত্রিকা অনলাইনে আপলোড হওয়ার কারণে তাদের বিক্রি কমে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন, তখন কিন্তু পত্রিকার মালিকগণ অনলাইন প্রকাশ বন্ধ করেননি। বরং তারা তাদের প্রকাশনীতি পরিবর্তন করেছেন, কারণ এই অনলাইন ভার্সনই তাদের আয়ের একটি অন্যতম বড় মাধ্যম।

এভাবেই সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের ই-পেপারকে একটি লাভজনক ব্যবসায়িক প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করেছে। আর আমরা নিজেদের আলস্য, হীনমন্যতা ও চিন্তার দীনতার কারণে অভিযোগ করতে থাকি–পিডিএফ বা ই-বুক বানালে তো বই বিক্রি কমে যাবে! অথচ ইউরোপের মতো অঞ্চলে ই-বুক একটি বিশাল বাণিজ্যিক অস্ত্র হিসেবে পরিগণিত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন তথা গোটা ইউরোপজুড়ে মোট জিডিপির আনুমানিক ০.৫% ই-বুক খাত থেকে অর্জিত হয়। এই খাতের বাৎসরিক আর্থিক মূল্য প্রায় ৯ থেকে ১০ বিলিয়ন

মার্কিন ডলার।[৬২] আজকাল ই-পাবলিশিং একটি বিরাট ব্যবসায়ে রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে অ্যামাজনে ই-বুক বিক্রি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। বই ডিজিটাল ফরম্যাটে প্রকাশ করলে প্রকাশকের খরচ অনেকটাই কমে আসে, কারণ এক্ষেত্রে আলাদাভাবে আর ছাপানোর খরচ বহন করতে হয় না। ফলে দামও কম রাখা সম্ভব হয়, এবং মুনাফার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থেকে যায়। হালফিল প্রকাশিত বইগুলো অধিকাংশ সাধারণ পাঠকদের সাধ্যের বাইরে চলে যায় উচ্চমূল্যের কারণে, কিন্তু ই-বুক আকারে প্রকাশ করলে সেই একই গ্রন্থ পাঠকের নাগালে চলে আসে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশেও কিছু প্রকাশনী এ পথে হাঁটতে শুরু করেছে। বইটই অ্যাপের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সীমিত আকারে হলেও ইসলামি বই ই-পাবলিশিংয়ের প্রচলন শুরু হয়েছে।

হয়তো আমাদের ইসলামি প্রকাশনীগুলোর বেশিরভাগ প্রকাশকই জানেন না "মার্কেটিং" বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবে তা করতে হয়। ফলে তাদের দ্বারা বই বিক্রি হয় না। এর সমাধান হিসেবে তারা সরাসরি ই-পাবলিশিংয়ের পথকে বেছে নিতে পারেন। যেমন, প্রকাশনীর নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে সেখানে ই-বুক বা অডিও বুক স্বল্পমূল্যে উন্মুক্ত করে দিয়ে বিজ্ঞাপন সংযুক্ত রাখলে ভিজিটর বাড়ার সাথে সাথে বিজ্ঞাপন থেকেই আয় আসবে। ঠিক যেমন পত্রিকাগুলো আয় করে থাকে। প্রকাশনীগুলোও একই ধাঁচে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ, সময়ের চাহিদা সামনে রেখে বিভিন্ন বৈধ পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমেই আয়ের পথ তৈরি হতে পারে। অথবা তারা এগুলো জানেন ঠিকই, কিন্তু কিছু করতে চান না।

বর্তমান বাস্তবতা বিচারে অধিকাংশ ইসলামি লেখক বা অনুবাদকের বইয়ের সিংহভাগ বিক্রয় হয় মূলত তাদের নিজেদের মাধ্যমে, প্রধানত সোশ্যাল

---

[৬২] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/europe-e-book-market

মিডিয়ার পোস্টের ভিত্তিতে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পুরো বছরে এর দশভাগের এক ভাগও বিক্রি করা সম্ভব হয় না। অথচ লেখকদের না আছে কোনো প্রকাশনা সংস্থা, না আছে কোনো ছাপাখানা। নেই বাংলাবাজারে কোনো বুকশপ, অন্য কোনো জায়গায় আউটলেট তো থাকার প্রশ্নই আসে না। বাইরের দেশের লেখকদের ক্ষেত্রেও চিত্র অভিন্ন। বরং তারা তো আরও এক কদম অগ্রসর! বই ছাপানোর আগেই পিডিএফ সংস্করণ উন্মুক্ত করে দেন অনেকেই। তারপরও তাদের শত শত গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে এবং সবকটিই সার্থকভাবে বিক্রি হচ্ছে। অতএব, "পিডিএফ শেয়ার করলে বই বিক্রি হয় না"—এই যুক্তি অন্তত আমাদের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য না।

অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন ইসলামি প্রকাশনাগুলোর ব্যাপারে এভাবে বলাটা তিরস্কারের সামিল। এক্ষেত্রে আমাদের জবাব হলো, এখানে তিরস্কারের কিছু নেই। যদি প্রকাশকদের কোনো ব্যবসায়িক দুর্বলতা পারস্পরিক বাতচিত থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে তা সংশোধন করাটা তাদের ব্যবসার জন্যেও উপকারী। এটাকে তিরস্কার হিসেবে গায়ে মেখে ধর্মীয় বিতর্ক শুরু করাটা বোকামি। আমরাও তো গ্রাহক। প্রকাশনীগুলোর একজন গ্রাহকের মনস্তত্ত্বের কথাও মাথায় রাখা উচিত। কত ব্যবসায়ীরা তাদের গ্রাহকদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য কাস্টমার কেয়ারের নামে একটি সম্পূর্ণ ডিপার্টমেন্ট খুলে বসে আছে, যাতে গ্রাহক পরিপূর্ণ সেবা পেয়ে আবারও ফিরে আসে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ইসলামি প্রকাশনার প্রকাশকরা ফিডব্যাককে মোটেও গুরুত্ব দিতে চান না। মানে তারা ইসলামি বইয়ের ব্যবসা করেও কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক নীতিমালা অনুসরণ করেন না। আর কেউ যদি এই বিষয়ে প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন তাদের ভাবখানা হয় এমন—"তুমি এখন আমাদের ব্যবসা শিখাবে?" অথচ আমরা তো মুদ্রণ ব্যবসায়ী নই, আর না এমন কোনো অবস্থানে আছি যে প্রকাশকদের ব্যবসা শিখাব। আমরা তো

কেবল আধুনিক ধারণার আলোকে তাদের গ্রাহক প্রতিক্রিয়া (customer feedback) জানাচ্ছি, যেন তারা তাদের ব্যবসা ফলপ্রসূ করতে পারেন, দীনের খেদমত করতে পারেন এবং আমাদেরও উপকার করতে পারেন। আর গ্রাহককে প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার তো তারাই আমাদের দিয়েছেন। প্রতিটি সৎ ব্যবসায়ীই তা গ্রাহকদের দিয়ে থাকে।

আর মূল কথা হলো বিনামূল্যে কোনো প্রকাশনীই বই ছাপে না। প্রকাশনীকে এর জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়। এমনকি তারা প্রতিটা পৃষ্ঠা ছাপার জন্য পাই টু পাই খরচ নিয়ে থাকে। ছাপার পর সেই বইয়ের বিক্রিত প্রতিটি কপি থেকে তারা একটি নির্ধারিত লভ্যাংশ রেখে পুনরায় একই বই হতে দ্বিতীয়বারের মতো মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ, বই ছাপানোর জন্য পৃথক মুনাফা এবং বিক্রির জন্য পৃথক মুনাফা। আর আমরা যতটুকু জানি কমবেশি প্রায় সব প্রকাশকেরই বিধিবদ্ধ পদ্ধতি এটি। তাই যেসব বই প্রকাশনীর গুদামে ধরা পড়ে আছে, সেগুলো নিয়ে লেখকদের মন খারাপ করার কিছু নেই। লেখক নিজে সামান্য উদ্যোগ ও সাহস দেখিয়ে প্রকাশনীর আগেই সেই বইগুলো বিক্রি করতে পারেন।

দেখা যায়, কোনো ইসলামি প্রকাশনী যখন নিজেরাই পুঁজি বিনিয়োগ করে বই প্রকাশ করে, তখন সেই বই বিক্রির জন্য তারা প্রাণপণ পরিশ্রম করে—কারণ, সেখানে তাদের নিজেদের টাকা ঢালা আছে। অথচ একই প্রকাশনী যখন কোনো লেখকের বই চুক্তি করে ছাপে, যেখানে বিনিয়োগ করেন লেখক আর লভ্যাংশও প্রকাশনীর ঝুলিতে যায়, তখন বিক্রির দায়দায়িত্বে তাদের উদাসীনতা চোখে পড়ে। মুনাফা তুললেও বিক্রি বাড়ানোর জন্য কাঙ্ক্ষিত সেই পরিশ্রম তারা করেন না। এ ধরনের আচরণকে ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বলা চলে না।

সুতরাং জবাব পাল্টা জবাবে না গিয়ে সমস্যাটা কী বুঝতে হবে এবং সমাধান বের করার চেষ্টা করতে হবে। নিজেদের প্রকাশিত বই বিক্রি হচ্ছে না ওদিকে অন্য প্রকাশনী বিক্রি করে কুলাতে পারছে না, তাই কৌশলে তাদেরগুলোকে উত্তম-মধ্যম দেওয়ার যেই ব্যাপারটা, সেটা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে। একজন প্রকাশক যেহেতু তার মুদ্রিত বই বিক্রি করতে পারছেন না, তাই আগে তাকে এর কারণগুলো খুঁজে বের করে নির্মূল করার চেষ্টা করতে হবে। তবেই বই বিক্রি হবে ইনশাআল্লাহ। এখন প্রকাশকরা যদি পরিশ্রম করা কঠিন মনে করেন এবং তাদের একমাত্র জবাব হয়–পিডিফের কারণে বই বিক্রি হয় না; তাহলে আমরা বলব, প্রকাশের সাথেসাথে বা কিছুদিনের মধ্যে অহরহ বইয়ের পিডিএফ শেয়ার হচ্ছে। আর সেই পিডিএফ পাঠকদেরই একটি বড় সংখ্যক পরবর্তীতে বইটির হার্ডকপি সংগ্রহ করছে। একটি ভালো বইয়ের ক্ষেত্রে পিডিএফ সংস্করণ প্রকাশিত হলে হার্ডকপি বিক্রি আরও বেড়ে যাওয়ার কথা। যেসব বইয়ের হার্ডকপি দুর্লভ কিংবা অনুপলব্ধ, এমন বহু বইয়ের পিডিএফ সংস্করণ থেকেই প্রতিদিন নীলক্ষেতে ছাপা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কপি। এর নেপথ্যের একমাত্র কারণ হলো পাঠক আগে পিডিএফ পড়ে বইটিকে চিনেছেন, ভালোবেসেছেন। এরপরই পাঠ ও সংগ্রহের তৃষ্ণা মেটাতে তিনি কাগজে ছাপিয়ে নিজের বুকশেলফে সাজিয়ে রাখছেন সেই বই। আর পিডিএফ পড়ার পর পাঠক যদি বইটি না কিনে থাকেন, তাহলে এর অর্থ হতে পারে বইয়ে বিশেষ কিছু নেই বা প্রকাশক বইয়ের দাম অনেক বেশি নির্ধারণ করেছেন। তাই আগে বইকে মানসম্মত করতে হবে। দাম ঠিক রাখতে হবে। সময়ের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে হবে। সমসাময়িক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বই প্রকাশ করলে বই আবার কীভাবে বিক্রি না হয়ে থাকে!

হাতেগোনা দুয়েকটা প্রকাশনী শুধুমাত্র ইসলামি প্রকাশনার মার্কেটিং কীভাবে করতে হয় তা জানে। কিন্তু আজকের দিনে ইসলামি বই বিক্রি না

হওয়ার মূল আরেকটি কারণ হলো বইয়ের বিষয়বস্তু। উন্নতমানের কাগজ, চোখ জুড়ানো ছাপা, মনোমুগ্ধকর শিরোনাম, নতুনত্বময় প্রচ্ছদ–সবই আছে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নেই, সেই পুরোনো কথাগুলোই; কেবল নতুন শাড়িতে পুরোনো বধূ–এতে কি আর বই বিকোবে?

"এখন আর আগের মতো পাঠক নেই!" বলে অভিযোগ করাও যথেষ্ট নয়। এটাও তো ভেবে দেখা দরকার, প্রকাশক পাঠকদেরকে দিচ্ছেটা কী? যদি প্রকাশকের কাছে কয়েকটি ঐতিহাসিক রচনার অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তবে তার এই অভিযোগ মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। যদি পাঠকের অভিযোগ হয় প্রকাশকরা সমাজের বাস্তব, জীবন্ত ও জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর উপর কোনো বই প্রকাশ করেন না, আর যদি কখনো করেনও, তাতে এমন কিছু থাকে না যা সমাজের অনুভূতিকে স্পর্শ করে, মানুষের সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে কিংবা সমাধানের পথে আলোকবর্তিকা তুলে ধরে–তবে সেই অভিযোগের জবাব প্রকাশকদের কাছে আছে কি? আর যদি বাস্তবতা সত্যিই এমনই হয়, যেমন পাঠকের অভিযোগ, তাহলে পাঠক তো এমন পিডিএফ পড়ে বই কেনার কথা ভাববেনই না; বরং টাকা বেঁচে যাওয়ায় তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন।

সারকথা

দীনী ইলম কিংবা এমন কোনো অপরিহার্য জ্ঞান, যা মানবজাতির কল্যাণের জন্য অত্যন্ত জরুরি; যদি কেউ সেই জ্ঞানকে কেবল ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিতরণ করতে শুরু করে, তবে তা মানবজাতির ক্ষতির কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে তার এমন ব্যবসা শুরু করা বৈধ হবে না। অন্যদিকে, যদি দেখা যায় কেউ সেই জ্ঞানকে বিনামূল্যে মানুষের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছে, যেমন ইসলামি বইয়ের

পিডিএফ ফ্রী বিতরণ করছে, যেখানে বই স্ক্যান, ওয়েবসাইট ডোমেই ও হোস্টিংসহ প্রভৃতি কাজে তার যথেষ্ট খরচ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মাঝে জ্ঞান নিঃশুল্ক পৌঁছে দিচ্ছে, তবে এতে দোষের কিছু নেই। এমন পরিস্থিতিতে সেটিকে নিষিদ্ধ বলা যায় না। কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে, যেখানে মূল লেখক ও প্রকাশককে একচেটিয়া ব্যবসা করতে অনুৎসাহিত করা হয়েছে, সেখানে তৃতীয় পক্ষের জন্য সেই জ্ঞানকে বাণিজ্যের পসরা বানানো নাজায়েয।[৬৩] তবে লেখক ও অনুবাদকের জন্য তাদের বইয়ের মূল্য

---

[৬৩] আমাদের সমাজে ইলমকে বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত করার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে, তা অত্যন্ত হতাশাজনক। ইসলামি সমসাময়িক বইপত্রের কথা বাদই দিলাম, কুরআনসহ দারসে নিযামির আবশ্যিক কিতাবগুলো পর্যন্ত তালিবুল ইলমদের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ব্যয়ের অজুহাতে প্রকাশনীগুলোর একে অপরকে ছাড়িয়ে উচ্চমূল্যে বই বিক্রির প্রতিযোগিতা দুঃখজনকভাবে ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কঠোর কপিরাইট নীতি, যা এক ধরনের বাণিজ্যিক স্বার্থের বেড়াজাল সৃষ্টির মাধ্যমে ইলমকে বন্দী করে ফেলছে। প্রকাশক, লেখক ও অনুবাদকদের নানাবিধ খেয়ানত এবং নেপথ্যের অসংখ্য অনিয়মের কথাগুলি ফিতনার আশঙ্কায় উহ্য রাখলাম। আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ও একই কারণে অনুল্লিখিত রইল। এই পুস্তিকা সংকলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো কপিরাইটের শরঈ অবস্থানকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা। তাই এখানে যথাসম্ভব সমালোচনা ও বিতর্কমূলক ভাষা পরিহার করে, ফিকহ, যুক্তি ও সমকালীন আইনশাস্ত্রের আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে যে কপিরাইট পুঁজিবাদী যুলুমনির্ভর এক আইন। শুধু ইসলামি প্রকাশনার ক্ষেত্রেই নয়; বরং অন্যান্য জ্ঞান, শিল্প, গবেষণা ও সৃজনশীলতার ক্ষেত্রেও কপিরাইট কীভাবে মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনতে পারে, এ পুস্তিকায় তারও স্পষ্ট উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকাশক, লেখক ও অনুবাদকদের কপিরাইট আরোপ করে ইলম নিয়ে একচেটিয়া কদর্য বাণিজ্য করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বরং ইলমকে দায়িত্বশীলতার সাথে সর্বত্র সহজ, অবাধ ও স্বল্পমূল্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। সবচে বড় কথা যা না বললেই নয়, যখন কোনো বই প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশ চলমান আছে, তখন তার পিডিএফ বা নকল কপি বিক্রি করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। যারা এই ঘৃণ্য কাজ করে, এরাই ইলম প্রচারের পথে এ যুগের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের কারণেই লেখক ও প্রকাশক কপিরাইট আরোপে বাধ্য হচ্ছেন। এরা ইলম প্রচারের পথ সহজ করছে না; বরং জটিল করছে। কিন্তু অপরদিকে, যদি কোনো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি ও সামষ্টিক মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট জ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ অযৌক্তিক উচ্চমূল্যে বিক্রি করে যে সাধারণ মুসলিম জনগণ তা কিনতে অসমর্থ হয়, সে অবস্থায় কেউ সেই গ্রন্থ নকল করে কম মূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দিলে, তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কিছু নেই।

গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। একইভাবে, প্রকাশকের জন্যও তার প্রকাশিত বইয়ের দাম নেওয়া বৈধ। কিন্তু, শরীয়তের দৃষ্টিতে—যাদের কাছে বই বিক্রি করা হয়েছে, তাদের ওপর বইয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অধিকার লেখক বা প্রকাশক কারোরই নেই। অতএব, বইয়ের নতুন মালিকের জন্য এটি সম্পূর্ণ বৈধ যে, তিনি চাইলে বইটি অন্য কাউকে উপহার দিতে পারেন, কিংবা এর ফটোকপি করে বিনামূল্যে মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন। এমনকি, তিনি এটি কোনো গ্রন্থাগারে রেখে শত শত মানুষকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন, অথবা বইটিকে স্ক্যান করে এর পিডিএফ ইন্টারনেটে সর্বসাধারণের উপকারের জন্য শেয়ার করতে পারেন। বস্তুত, একবার কোনো বস্তু বিক্রি হয়ে গেলে সেটি ক্রেতার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়, এর পরবর্তী ব্যবহারের ওপর কোনো প্রকার শর্ত বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অধিকার বিক্রেতার নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সমাপ্ত